Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে বৈধ খাবার ব্যবস্থা ও সুদমুক্ত অর্থনীতি এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদ -জিহাদ ও পাশ্চাত্য মিডিয়া

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাদিয়া বেগম

রোলঃ 21500247

৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
ইসলামে বৈধ খাবার ব্যবস্থা ও সুদমুক্ত অর্থনীতি এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদ -জিহাদ ও পাশ্চাত্য মিডিয়া

এই রিপোর্টটি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাদিয়া বেগম

রোলঃ 21500247

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামে বৈধ খাবার ব্যবস্থা ও সুদমুক্ত অর্থনীতি এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদ -জিহাদ ও পাশ্চাত্য মিডিয়া" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাদিয়া বেগম, আইডিঃ 21500247 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে বৈধ খাবার ব্যবস্থা ও সুদমুক্ত অর্থনীতি এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদ -জিহাদ ও পাশ্চাত্য মিডিয়া " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নাদিয়া বেগম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

নাদিয়া বেগম

আইডিঃ 21500247

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgments)

প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় আম্মু এবং বোনদের।যারা সবসময় আমাকে থিসিসের যাবতীয় বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছে।বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন প্রতিকূলতা, অসুস্থতা, হতাশা তে আমার পাশে থেকে শক্তি সামর্থ্য, সাহস,উদ্দীপনা যুগিয়েছেন।এছাড়াও থিসিসটি সম্পুর্নকারে প্রনয়নে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে। তাদের এই অক্লান্ত ভালোবাসা এবং দোয়ায় আমার এই থিসিসটি সম্পুর্ন হয়েছে।

এরপর প্রথমেই আমি আমার থিসিসের তত্ত্বাবধায়ক,শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শফিউদ্দিন শাকিল এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।এই থিসিসটি সম্পুর্ন করতে উনার উপদেশ, পরামর্শ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। থিসিস পেপার লিখার সময় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উনার আন্তরিকতা সীমাহীন ছিলো বলে আমার মনে হয়।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের মাদ্রাসার চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় ইন্জিনিয়ার খন্দকার মারছুছ উস্তাদ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । উনার কাছ থেকে বিভিন্ন সময় অনেক উপদেশ ও পরামর্শ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ।

সকলের দোয়া এবং আল্লাহর অশেষ রহমত কামনা করছি।

কৃতজ্ঞতায়

(নাদিয়া বেগম)

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভুমিকা	৬
মানুষের জন্য আমিষ খাবার কি অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ	১১
সুদমুক্ত অর্থনীতি	২০
মিডিয়া ও ইসলাম	২৮
সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৩৫
সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি	৫৬
বিশ্ব জনীন ভ্রাতৃত্ব	৬৩
উপসংহার	৭১
তথ্যসুত্র	৭৭

ভুমিকা

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা । দৈনন্দিন জীবনে মানুষ মহান আল্লাহর আদেশ যেমন- সালাত, সাওম, হজ, যাকাত পালন করা এবং নিষেধ যেমন- সুদ, ঘুষ, বেপর্দা, বেহায়াপনা ইত্যাদি পরিহার করে চলাকে ইবাদত বলে । তেমনিভাবে নবি ও রাসুলের দেখানো পথ অনুযায়ী একে অপরের সাথে উত্তম আচার ব্যবহার করাও ইবাদত। মূলত ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করা হয় । এর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ।

ইবাদত আরবি শব্দ । এর অর্থ হলো চূড়ান্তভাবে দীনতা-হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং নমনীয় হওয়া । আর ইসলামি পরিভাষায় দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ তায়ালার মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয় । আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে সহজভাবে জীবনযাপন করার জন্য অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন । আমরা আল্লাহর বান্দা। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ : "জিন ও মানবজাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি ।" (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

আমরা পৃথিবীতে যত ইবাদতই করি না কেন, সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা । আর এ ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না । আল্লাহ তায়ালা বলেন- "তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে ।" (সূরা আল-বাইয়্যিনা, আয়াত ০৫)

কীভাবে ইবাদত করলে ও জীবনযাপন করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন, তা শেখানোর জন্য নবি-রাসুলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন । আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অনুসরণ করতে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন । মহান আল্লাহ বলেন, "(হে নবি!) আপনি

বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তো কাফিরদের পছন্দ করেন না ।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৩২)

আল্লাহর আদিষ্ট কাজগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায় করে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ও কৃষিকাজ করা এবং বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও দুনিয়ার অন্যান্য সকল ভালো কাজ করা ইবাদত। এমনিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রহমতের আশা, শাস্তির ভয়, ইখলাস, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সব কাজই ইবাদতের মধ্যে শামিল ।

আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর প্রদর্শিত পন্থা যথাযথভাবে অনুসরণ করলে পরকালে আল্লাহ আমাদের পুরস্কৃত করবেন । ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা শান্তি পাব ।

ইসলাম যে পাঁচটি রুকনের (স্তম্ভের) উপর প্রতিষ্ঠিত

(১) এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল; (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা; (৩) যাকাত দেওয়া; (৪) রমযানের রোযা রাখা; (৫) হজ করা ।" (সহিহ বুখারি)

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার উৎসগুলোর মধ্যে যাকাত হলো অন্যতম । এর উপর ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য নির্ভরশীল । এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয় । ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতেও যায় । ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয় । উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায় । মাথাপিছু আয় বেড়ে যায় । রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত ও শক্তিশালী হয় । আর্থিকভাবে অসচ্ছল লোকগুলো ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে । দিনে দিনে সম্পদশালী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَ يُرْبِي الصَّدَقَتِ،

অর্থ : "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন ।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৬)

মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটি শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতির উপরই সীমাবদ্ধ নয়। জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ রেখার প্রণেতা হিসেবে ইসলামে রয়েছে জীবন ধারনের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা। এ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে হালাল উপায়ে উপার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণও অন্যতম একটি মৌলিক ইবাদত। শুধু তাই নয়, ইসলাম এটিকে অত্যাবশ্যক (ফরয) কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস প্রনিধানযোগ্য। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

"ফরয আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনও ফরয।"

আমরাও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য যথাযথভাবে যাকাত আদায়ের চেষ্টা করব।

জিহাদ আরবি শব্দ । এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি । আর ইসলামি পরিভাষায় জান-মাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দীনকে (ইসলামকে সমুন্নত করাই হলো জিহাদ । অনেকেই জিহাদ বলতে (শুধু) রক্তপাত ও কতল (হত্যা) বোঝেন । এটা সঠিক নয়। কেননা জিহাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। পৃথিবীর যা কিছু উত্তম তাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি । আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুধু জিহাদ হতে পারে । আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ط

অর্থ : "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত ।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৭৮)

বস্তুত সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের চেষ্টা, শ্রম ও সাধনাই হলো জিহাদ।

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন প্রকার-

(১) স্বীয় নফসের (প্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করা । যেমন হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন-

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ

অর্থ : "প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে ।" (মুসনাদে আহমাদ) এরূপ জিহাদকে রাসুলুল্লাহ (স.) সবচাইতে বড় জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন । তিনি বদর যুদ্ধ থেকে

ফিরে এসে বলেছেন-

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

অর্থ : "আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের (কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ) দিকে ফিরে এসেছি ।" (কানযুল উম্মাল)

(২) জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ করা। এরূপ জিহাদকে পবিত্র কুরআনে জিহাদে কাবির (বড়) বলা হয়েছে ।

আল্লাহ বলেন-

فَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থ : : "সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের (জ্ঞানের) সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল জিহাদ চালিয়ে যান ।" (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৫২)

(৩) ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । এটি হলো জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর । কেউ ধর্মদ্রোহী হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ।

সন্ত্রাসবাদ বলতে আমরা বুঝি পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের আশায় বিশৃঙ্খলা ও তাণ্ডবলীলার মাধ্যমে

জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ও তাদের ক্ষতি করা ।

ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছে । বস্তুত উভয়ের মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান । বলা যায়, এ দুটো পরস্পর বিপরীত । রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদের লোভ, খুন-খারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয় । বরং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য । মানুষকে সত্যনিষ্ঠ ও নৈতিকগুণে গুণান্বিত করাও জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ:

অর্থ : "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ।" (সূরা আল- আনফাল, আয়াত ৩৯)

পক্ষান্তরে, সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদ অর্জন করা এবং লুটতরাজ ও খুন-খারাবির মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তপাত করতে শিখায়নি। বরং ইসলাম যে জিহাদের কথা বলে তাতে রক্তপাত নয়, মানবতার দিকনির্দেশনা দেয়। মুসলমানদের কোনো জিহাদেই নিরপরাধ সাধারণ লোকজনের কোনো ক্ষতি হয়নি ।রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় একশত-এর কাছাকাছি জিহাদে (যুদ্ধে) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন । সবগুলো জিহাদ মিলিয়ে উভয়পক্ষে পাঁচশ এর কম লোকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

বর্তমান যুগে জিহাদের নামে যেভাবে বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, খুন-খারাবি ও নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই । বরং এটা সন্ত্রাসেরই নামান্তর । বস্তুত জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয় ।

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=8&chapter=1612

বিষয়: মানুষের জন্য আমিষ খাবার কি অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ

আব্দুল্লাহঃ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা তুহ্

শেখ তাপশঃ

ওয়ালাইকুম সালাম

আব্দুল্লাহঃ

কেমন আছেন ভাই

শেখ তাপশঃ

আছি ভালোই

আবদুল্লাহ :

তাপশ ভাই : আপনি তো একজন মুসলিম।মুসলিম হয়েও আপনি কি জানেন, ইসলামে মুসলিমদের খাবারে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে?

শেখ তাপশ :

না ভাই,পুরোপুরি জানি না।শুনেছি আমিষ খাদ্য নাকি মুসলমানদেরকে প্রচন্ড উগ্র বানিয়ে ফেলে , বিজ্ঞান আমাদের বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলমানদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে? ইসলামের মানুষের খাবারের মধ্যে আমিষ খাবারের কোনো বাধ্যবাধকতা কি আছে?

আবদুল্লাহ:

পশুর মধ্যে শুধু তৃনভোজী পশু খাওয়া অনুমোদিত।ব্যক্তি যা আহার করে তার প্রতিক্রিয়া তার আচরণে প্রকাশ পায়। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদি হিংস্র মাংসাশী প্রাণী খাওয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে- এটা তার অন্যতম একটি কারণ। এ ধরনের হিংস্র হয়ে উঠতে

পারে। সে কারণে ইসলাম শুধু মাত্র গরু, মহিশ, ছাগল, ভেড়ার মতো শান্ত ও খুব সহজে পোষমানা প্রাণীর মাংস খেতে অনুমতি দেয়। বস্তুত এ কারণেই মুসলমানরা শান্তিকামী- শান্তিপ্রিয়।

আর সুস্থ-সবল শরীরে আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো উত্তম ও সুস্বাদু খাবার গ্রহণে ইসলামের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য এবং শারীরিক পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। আবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেলে তা স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

অর্থাৎ,অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ ও অপচয় করা থেকে নিরুৎসাহ করা হয়েছে।

তবে,ইসলামি শরীয়তে আমিষ খাবারের মধ্যে হালাল - হারাম নির্ধারণ করে দিয়েছে।

→ আমিষ হলো, যে খাদ্যে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন একত্রে থাকে সেগুলোই আমিষ খাদ্য। আমিষ মূলত দুই প্রকার। ১) প্রাণীজ, ২) উদ্ভিজ্জ।

প্রাণীজ আমিষ হলো, যেগুলো প্রানী থেকে পাওয়া যায়। যেমনঃ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। আর উদ্ভিজ্জ আমিষ হলো যেগুলো উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। যেমনঃ ডাল, বাদাম, সয়াবিন, গম ইত্যাদি।

→ নিরামিষ হলো, যে খাদ্যে আমিষের পরিমান কিঞ্চিৎ পরিমানও নেই। যেমনঃ ধান, পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি।

প্রানীজ আমিষের মধ্যে রয়েছে দুই ধরনের প্রাণী -স্থলজ প্রাণী ও জলজ প্রাণী।

তাপশ: ভাই খাদ্য গ্রহণে ও ইসলামের কোনো রীতি নীতি আছে কি?

আবদুল্লাহ :

জ্বি আছে ভাই।পবিত্র, স্বাস্থ্যসম্মত ও উপকারী সবধরনের খাবার গ্রহণে ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে। যেসব খাবার অপবিত্র ও অবৈধ তা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আপনি বলে দিন, যা কিছু বিধান ওহির মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, আহারকারী যা আহার করে তাতে তার জন্য আমি কোনো হারাম

খাবার পাই না; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস—এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ। (সুরা আন-আম, আয়াত:১৪৫)

সাধারণত যেসব খাবার আমরা গ্রহণ করে থাকি, তা দুই প্রকার।

একটি পশু-পাখি, অপরটি উদ্ভিদ ও শাকসবজি।

পশু-পাখি : পশু-পাখির ক্ষেত্রে কিছু নিদর্শন ও বিধি-বিধান লক্ষ্য করলে হালাল-হারাম নির্ণয় করা সহজ। যে প্রাণীতে হারামের কোনো চিহ্ন পাওয়া যাবে, তা খাওয়া জায়েজ নেই।

দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু হারাম। যেমন- বাঘ-সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ, হাতি, কুকুর, শিয়াল, শূকর, বিড়াল, কুমির, কচ্ছপ, সজারু ও বানর ইত্যাদি।

পাঞ্জাধারী হিংস্র পাখি খাওয়া হারাম। যেমন, ঈগল, বাজ, শ্যেন, পেঁচা ইত্যাদি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) দাঁতবিশিষ্ট প্রত্যেক হিংস্র জন্তু ও নখ দিয়ে শিকারকারী প্রত্যেক হিংস্র পাখি খেতে নিষেধ করেছেন। ' (মুসলিম, হাদিস নং : ১৯৩৪)

নির্দিষ্টভাবে যেসব পশু খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা খাওয়া হারাম। যেমন, গৃহপালিত গাধা। জাবের (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) খায়বরের দিন গৃহপালিত গাধা খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন। ' (বুখারি, হাদিস নং: ৪২১৯, মুসলিম, হাদিস নং: ১৯৪১)

আরেকটি উদাহরণ, শূকর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত। ' (সুরা মায়েদা, আয়াত : ৩)

নোংরা ও নাপাক কিছু খাওয়া হারাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তাদের জন্য তিনি (রাসুল) পবিত্র বস্তু হালাল করেন আর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন। ' (সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭)

যেমন- মৃত জন্তু, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, প্রবাহিত রক্ত এবং সেসব খাবারে কোনো প্রকার উপকার নেই যেমন বিষ, মদ, খড়কুটা, মাদকদ্রব্য, তামাক ও অন্যান্য নেশজাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি।

যেসব প্রাণী হত্যা করতে শরিয়ত নিদের্শ দিয়েছে বা যেসব প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছে, তা খাওয়া হারাম। যেমন- ইঁদুর, সাপ, টিকটিকি, বিচ্ছু, কাক, চিল ইত্যাদি। কারণ হাদিসে এগুলোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইসলামকর্তৃক নিষিদ্ধ প্রাণীও হারাম। যেমন- হুদহুদ, দোয়েল, ব্যাঙ, পিঁপড়া ও মৌমাছি ইত্যাদি।

আল্লাহ নাম নেওয়া ছাড়া জবাইকৃত হালাল পশু-পাখিও হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা তা থেকে আহার করো না যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্গন। ’ (সুরা আন-আম, আয়াত : ১২১)

হালাল প্রাণী জবাই শুদ্ধ না হলে, জবাইকৃত সে প্রাণীও হারাম। আবার জীবিত প্রাণী থেকে আলাদা করা গোশতও মৃত প্রাণীর মতো হারাম। জবাই করার কিছু ইসলামী নিয়ম-নীতি ও শর্ত রয়েছে। সেগুলো পূর্ণ না হলে, জবাইকৃত হালাল জন্তুও হারাম হয়ে যায়।

নাপাক বস্তু থেকে সৃষ্ট পোকা-মাকড় এবং যার শরীরে প্রবাহিত রক্ত নেই, সেগুলোও নাপাক। যেমন তেলাপোকা ইত্যাদি।

সব ধরনের মৃত প্রাণী এবং প্রবাহিত রক্ত হারাম। তবে দুই ধরনের মৃত প্রাণী ও রক্ত হালাল। রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমাদের জন্য দু’প্রকার মৃত প্রাণী ও দু’প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী হলো, মাছ ও পঙ্গপাল। আর রক্ত হলো, কলিজা ও প্লীহা। ’ (মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং : ৫৭২৩, ইবনু মাজাহ, হাদিস নং: ৩২১৮)

যেসব পশু বা পাখির অধিকাংশ খাদ্যই নাপাক, সেগুলোর ওপর আরোহণ করা, সেগুলোর গোস্ত-ডিম খাওয়া এবং দুধ পান করা হারাম।

উদ্ভিদজাতীয় খাবার: খাদ্য ও পানীয়ের মূল প্রকৃতি হচ্ছে বৈধ ও হালাল হওয়া। সে সূত্রে বিভিন্ন উদ্ভিদ, ফল, শস্য ইত্যাদি থেকে তৈরিকৃত পানীয় হালাল। তবে যত ধরনের

খাবার ও পানীয় নেশা তৈরি করে, তা খাওয়া বা পান করা জায়েজ নেই। যেমন, গাঁজা, আফিম, ইয়াবা, বিয়ার, শ্যাম্পেইন, হেরোইনসহ এ জাতীয় অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য।

যা কিছু শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর, তাও জায়েজ নেই। যেমন, বিষ, সিগারেট ও এলকোহল জাতীয় অন্যান্য খাবার ও পানীয়। যেগুলোর ক্ষতি ও অপকারিতা সবার কাছে স্পষ্ট।অতএব, সুস্থতা হল ইলম-আমলের পূর্ণ হক আদায় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।সুস্থতা এবং শরীরের ভারসাম্য মানুষকে যেমন কাজকর্মে স্পৃহা জোগায় তেমনি কাজটি যথাযথ আঞ্জাম দেওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে। তাই সাধারণভাবে সকল ক্ষেত্রে ‘সর্বোত্তম পন্থা মধ্যম পন্থা’ এর নীতি অবলম্বন করতে হবে। ইসলামী তাহযীব জীবনের সকল ক্ষেত্রের মতো এ বিষয়টিকেও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছি।

১) হালাল খাদ্য গ্রহণ ও বৈধ পন্থায় উপার্জন হালাল খাদ্য খেতে হবে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-‘হে রাসূলগণ! পবিত্র হালাল বস্তু আহার করুন এং সৎ কাজ করুন।-সূরা মুমিনূন : ৫১

'হে মানব সম্প্রদায় পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর।’-সূরা বাকারা:১৬৮

২) উপার্জিত খাদ্য বৈধ পন্থায় হতে হবে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।’-সূরা নিসা : ২৯

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা তা থেকে আহার করো না যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্গন। ’ (সুরা আন-আম, আয়াত : ১২১)

৩)স্বাভাবিক এবং সাধারণ খাবার খাওয়া।

সাধারণ খাদ্য খাওয়া এবং সহজলভ্য খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত থাকা, বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগী করা এটা ইসলামের আদর্শ।

৪)উদরপূর্তি নয়; কখনো পরিতৃপ্তি, কখনো অল্পে তুষ্টি।

খাদ্য নিয়ে মেতে থাকা এবং ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে এবং যে পরিমাণ আল্লাহ রিযিকে রেখেছেন ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থকা এবং নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

তাপশ:

তাহলে খাবার গ্রহণে রাসুল (সা.) এর সুন্নত নিশ্চয় আছে ?

আবদুল্লাহ :

জ্বি অবশ্যই আছে।রাসুল (সা.) তার প্রিয় সাহাবিদের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ—প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তার প্রতিটি কর্ম ও পদক্ষেপ মানবতার অনুসরণযোগ্য।

১)খাবার গ্রহণের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওআখিরাহ বলা। রাসুল (সা.) বলেন, 'আল্লাহর নাম নিয়ে ও ডান হাত দ্বারা খানা খাও। এবং তোমার দিক হতে খাও। ' (বুখারি, হাদিস নং : ৫১৬৭, তিরমিজি, হাদিস নং : ১৯১৩)

২)খাওয়ার আগে-পরে হাত ধোয়া

খাওয়ার আগে হাত ধোয়া মুস্তাহাব। খাওয়ার পরে হাত ধোয়া সুন্নত। (তুহফাতুল আহওয়াজি: ৫ / ৪৮৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৭৪৮৬; ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৪৯৩)

৩)দস্তরখান বিছিয়ে খাওয়া

আনাস (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) পায়াবিশিষ্ট বড় পাত্রে খাবার খেতেন না। কাতাদা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে কীসের ওপর খানা খেতেন? তিনি বললেন, 'চামড়ার দস্তরখানের ওপর। ' (বোখারি : ৫৩৮৬)

৪)ডান হাত দিয়ে খাওয়া

রাসুল (সা.) আজীবন ডান হাত দিয়ে খাবার খেতেন। বাম হাত দিয়ে খাবার খেতে নিষেধ করেছেন তিনি। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন,

‘তোমরা বাম হাত দ্বারা খাবার খেয়ো না ও পান করো না। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে। ’ (বুখারি, হাদিস নং: ৫৩৭৬; মুসলিম, হাদিস নং: ২০২২)

৪)প্লেটের একপাশ থেকে খাওয়া

খাবার প্লেটের এক পাশ থেকে খাওয়া সুন্নত। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘খাবারের মধ্যখানে বরকত নাজিল হয়। তোমরা একপাশ থেকে খাও। মধ্যখান থেকে নয়।’ (তিরমিজি, হাদিস: ১৮০৫; ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩২৭৭)

৫)হাত চেটে খাওয়া

রাসুল (সা.) খাওয়ার সময় সর্বদা হাত চেটে খেতেন। না চাটা পর্যন্ত কখনো হাত মুছতেন না। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমরা যখন খাবার গ্রহণ করবে, তখন হাত চাটা নাগাদ তোমরা হাতকে মুছবে (ধোয়া) না। ’ (বুখারি, হাদিস নং : ৫২৪৫)

৬)আঙুল চেটে খাওয়া

আঙুল চেটে খাওয়ার ফলে বরকত লাভের অধিক সম্ভাবনা থাকে। কারণ খাবারের বরকত কোথায় রয়েছে মানুষ তা জানে না। রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমরা যখন খাবার গ্রহণ করো তখন আঙুল চেটে খাও। কেননা বরকত কোথায় রয়েছে তা তোমরা জানো না। ’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ১৯১৪)

৭)পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়া

খাওয়ার সময় কিছু পড়ে গেলে তা উঠিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে খাওয়া সুন্নত। মহানবী (সা.) এমনটি করার নির্দেশনা দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ১৪২১৮; মুসলিম, হাদিস: ২০৩৪)

৮)হেলান দিয়ে না খাওয়া

কোনো কিছুর ওপর হেলান দিয়ে খাবার খেতে তিনি নিষেধ করেছেন। হেলান দিয়ে খাবার খেলে পেট বড় হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। আবু হুজাইফা

(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-এর দরবারে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন, আমি টেক লাগানো অবস্থায় কোনো কিছু ভক্ষণ করি না। (বুখারি, হাদিস নং: ৫১৯০, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯৮৬)

৯)খাবারের দোষ না ধরা

রাসুল (সা.) কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) কখনো খাবারের দোষত্রুটি ধরতেন না। তাঁর পছন্দ হলে খেতেন আর অপছন্দ হলে ত্যাগ করতেন।' (বুখারি, হাদিস: ৫১৯৮, ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৩৮২)

১০)যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা

ঘরে সব সময় ভালো খাবার থাকে না। তাই যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত। (মুসলিম, হাদিস: ২০৫২)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা আমার নিয়ামতগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য আমার নিয়ামত বাড়িয়ে দেব।' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত-৭)।

১১) খাবারে ফুঁ না দেওয়া

খাবার ও পানীয়তে ফুঁ দেওয়ার কারণে অনেক ধরনের রোগ হতে পারে। রাসুল (সা.) খাবারে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) কখনো খাবারে ফুঁ দিতেন না। কোনো কিছু পান করার সময়ও তিনি ফুঁ দিতেন না। (ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৩৪১৩)

১২) খাবারের শেষে দোয়া পড়া

আল্লাহ তাআলা খাবারের মাধ্যমে আমাদের প্রতি অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ করেন। এ দয়ার কৃতজ্ঞতা আদায় করা সভ্যতা ও শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। খাবার গ্রহণ শেষে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা অপরিহার্য।

খাবার শেষে রাসুল (সা.) আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতেন ও দোয়া পড়তেন। আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) খাবার শেষ করে বলতেন, ‘আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসিরান ত্বয়্যিবান মুবারাকান ফিহি, গায়রা মাকফিইন, ওলা মুয়াদ্দায়িন ওলা মুসতাগনা আনহু রাব্বানা। ’ তিনি কখনো এই দোয়া পড়তেন: ‘আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আতআমানা ওয়াছাকানা ওয়াজাআলানা মিনাল মুসলিমিন। ’ (বুখারি, হাদিস নং : ৫৪৫৮)

রাসুল (সা.)-এর সুন্নতগুলো জীবনে বাস্তবায়ন সম্ভব হলে, জীবন সুন্দর ও সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

[1] মানুষের জন্য আমিষ খাবার কি অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ - ডা. জাকির নায়েক

[2] https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/annesa/28911079

[3] https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=85932

বিষয়: সুদমুক্ত অর্থনীতি

আবদুল্লাহঃ

তাপশ ভাই কোথায় যাচ্ছেন?

শেখ তাপশঃ

সোনালি ব্যাংকে যাচ্ছি। একটা ফিক্সড ডিপোজিট খুলেছিলাম।সেখান থেকে কিছু টাকা তুলবো।

আবদুল্লাহঃ

তাপশ ভাই এসব ব্যাংকে লেনদেন তো হারাম।এখানে তো সুদের লেনদেন হয়।

তাপশঃ

তো?সুদের লেনদেন তো সব ব্যাংকেই হয়।

আব্দুল্লাহঃ

আপনি জানেন না ইসলামে সুদ হারাম।আর কেন ইসলামে সুদ কেন হারাম?

তাপশঃ

না,সম্পূর্ণভাবে জানি না।

আবদুল্লাহঃ

তাহলে শুনুন- ইসলামে রিবা বা সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম।'রিবা'র আভিধানিক অর্থ : বৃদ্ধি করা। যেমন-আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

'অতঃপর যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয়।'[সুরা হজ : ০৫]

আরও ইরশাদ করেন-

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

‘একদল অপর দলের চেয়ে বড় হবে।’[সুরা নাহল : ৯২] অর্থাৎ অধিক সংখ্যক। যেমন বলা হয় অমুকে অমুকের চেয়ে বেশি লাভ করেছে। রিবার আসল অর্থ বৃদ্ধি : তা মূলে নয়তো মূলের বিনিময়ের মাঝে। যেমন এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম। আবার প্রত্যেক হারাম ও নিষিদ্ধ ব্যবসাকেও রিবা বলা হয়।]

মহান আল্লাহ তাআলা সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করা সুন্নাহ আর সুদের কারবার করে অর্থ উপার্জন করা সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-‘যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ২৭৫)

সুদী ব্যাংকে লেনদেন

সুদী ব্যাংকে লেনদেন ব্যাপারে ইসলামি ফিকাহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে নিম্নে যা হুবহু তুলে দেয়া হলো- ইসলামি ফিকাহ বোর্ড পবিত্র মক্কাস্থ রাবেতা আলমে ইসলামি’র বিল্ডিংয়ে সাত দিনব্যাপী (১২-২৯ রজব ১৪০৬ হিঃ) অনুষ্ঠিত তার নবম বৈঠকে ভেবে দেখেছে যে, সুদী ব্যাংক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে এসব ব্যাংকে মানুষের লেনদেন। অথচ তাদের কাছে এসব ব্যাংকের বিকল্প নেই বললেই চলে।

বৈঠকে এই ভয়ঙ্কর সমস্যা নিয়ে সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সারগর্ভ আলোচনা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে শোনা হয়। তাদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, আধুনিক অর্থনীতির গবেষণা এ কথা সপ্রমাণ করেছে যে, সুদই বিশ্ব অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শান্তি-সমৃদ্ধির পথে সবচে’ বড় হুমকি। বিশ্বের অনেক সমস্যার আড়ালেই রয়েছে এর প্রত্যক্ষ ভূমিকা। চৌদ্দশ বছর আগেই ইসলামে হারাম ঘোষিত এই বিষাক্ত জীবাণু সমাজ থেকে নির্মূল করা ছাড়া বিশ্বশান্তি অধরাই থেকে যাবে চিরদিন। আর সুদ নির্মূলে সবচে’ কার্যকর পদক্ষেপ হলো, সুদ ও শরিয়ত অননুমোদিত লেনদেন মুক্ত ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। নিম্নে বৈঠকের উলেখযোগ্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হলো।

প্রথমত. প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত সুদী লেনদেন সর্বোতভাবে পরিহার করা। এবং সুদী কারবারে যে কোনো রকম সহযোগিতা থেকে বিরত থাকা।

দ্বিতীয়ত. সুদী ব্যাংকগুলোর উত্তম বিকল্প হিসেবে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিটি মুসলিম দেশ এবং বিশ্বের সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকায় ইসলামি ব্যাংকের প্রসার ঘটাতে হবে। এভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি অর্থনীতির বাস্তব রূপায়নে এসব ব্যাংক এক শক্তিশালী নেটওয়ার্কে পরিণত হবে।

তৃতীয়ত. প্রতিটি মুসলমানের জন্য দেশে-বিদেশে যেখানেই ইসলামি ব্যাংক বিদ্যমান সেখানে সুদী ব্যাংকে লেনদেন করা হারাম। কারণ ইসলামি ব্যাংকের মতো বিকল্পের বর্তমানে তার জন্য সুদী ব্যাংকে কারবার করার কোনো অজুহাত বাকি থাকে না। তার ওপর ওয়াজিব অপবিত্র পথ বর্জন করে পবিত্র পথে আসা এবং হারামের স্থলে হালাল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা।

চতুর্থত. এ বৈঠক মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান ও সুদী ব্যাংকসমূহের কর্ণধারদের প্রতি সুদের মতো পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে।

পঞ্চমত. সুদের লাভের পথে আহরিত সকল সম্পদই শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কোনো মুসলিমের (আমানতকারী) জন্যই তা নিজের বা পরিবারস্থ লোকদের প্রতি এ টাকা ব্যয় করা বৈধ নয়। বরং উটিৎ হলো, এ টাকা সাধারণ জনকল্যাণ মূলক কাজে যেমন- মাদরাসা, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণে ব্যয় করা। তবে এ টাকা খরচ করার সময় দান-সদকার নিয়ত করা যাবে না। বরং নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ত করতে হবে।

আবার কোনো অবস্থাতেই সুদী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশ বিদেশি ব্যাংকগুলোর জন্য ফেলে রাখা যাবে না। এতে গুনাহ বা অপরাধ বাড়বে বৈ কমবে না। কারণ বিদেশি ব্যাংকগুলো এ টাকা খৃস্টান মিশনারি বা ইহুদি প্রতিষ্ঠানগুলোয় ব্যয় করে। এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের এসব টাকা মুসলমানদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং তাদের সন্তানদের ঈমান হরণের পেছনে ব্যয় হয়।

সুদ হারাম হওয়ার কারণএবং হিকমত হলো - সুদের যে অতিরিক্ত অর্থ আসে তার জন্য মেধা ও শ্রম ব্যয় করতে হয় না। সময় শেষে তা থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়। এতে যে ব্যক্তি কর্জ গ্রহণ করে; ওই ব্যক্তির জন্য অতিরিক্তি অর্থ আদায় করা 'জুলুম'।,পবিত্র কোরআনে সুদভিত্তিক কর্মকাণ্ডে জড়ানোকে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের বকেয়া যা আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা তা না ছাড়ো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' (সুরা বাকারা: ২৭৮-২৭৯)

মুমিন মাত্রেই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা এমন কিছুর নির্দেশ দেন না বা এমন কিছু থেকে বারণ করেন না যাতে কোনো না কোনো হিকমত বা নিগূঢ় রহস্য লুকায়িত থাকে নেই। আমরা যদি সে রহস্য জানতে পারি তাহলে তা আমাদের জন্য অতিরিক্ত অর্জন। যদি না জানি তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের কাম্য ও কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ ও রাসূল সা. যা করতে বলেন তা সম্পাদন করা আর যা বারণ করেন তা থেকে বিরত থাকা। সুদ হারাম হওয়ার পশ্চাতে যেসব কারণ ও হিকমত কার্যকর তার কয়েকটি এই -

1. সুদ এক ধরনের জুলুম আর আল্লাহ তাআলা জুলুম হারাম করেছেন।
2. অসুস্থ হৃদয়ের মালিকদের প্রতারণার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া।
3. সুদের মধ্যে প্রতারণা রয়েছে।
4. পণ্যের মান ধরে রাখা।
5. সুদ আল্লাহ প্রবর্তিত পদ্ধতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।[1]

তাপশঃ

বলেন কি?

আবদুল্লাহঃ

জ্বি ভাই।

তাপশঃ

ভাই আমার তাহলে কিছু প্রশ্ন আছে।

আবদুল্লাহঃ

বলেন আপনার প্রশ্ন। আমার জানা থাকলে উত্তর অবশ্যই দিবো ইনশা-আল্লাহ।

তাপশঃ

আমার এই প্রশ্নগুলোর ইসলামি জবাব প্রত্যাশা করছি।

1. যে ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা রেখেছে বছরান্তে সে কি এর লভ্যাংশ গ্রহণ করতে পারবে ?
2. অতিরিক্ত লাভ দিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের ওপর ঋণগ্রহীতার লভ্যাংশ ভোগ করে না ?
3. যে ওইসব ব্যাংকে টাকা আমানত রাখে কিন্তু লভ্যাংশ ভোগ করে না ?
4. ওই সব ব্যাংকে চাকুরীরত কর্মকর্তা চাই সে পরিচালক বা অন্য কেউ ?

আবদুল্লাহঃ

লাভের ওপর ব্যাংককে লাভের ওপর ঋণ বা আমানত দেয়া কোনোটাই জায়িয নেই। কারণ এ দুটোই সুস্পষ্ট সুদ। ব্যাংক ছাড়া অন্য কোথাও লাভের ওপর অর্থ আমানত রাখা জায়িয নেই। এভাবে লাভের ওপর কাউকে কর্জ দেয়াও জায়িয নেই। কারণ এর সবই উলামায়ে কেরামের সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। ইরশাদ হয়েছে-'আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।বাকারা : ২৭৫

আরও ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন।[বাকারা : ২৭৬] অন্যত্র ইরশাদ করেন- 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু

যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না।'[বাকারা : ২৭৮] এসবের পর আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যদি সে অসচ্ছল হয়, তাহলে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তার অবকাশ রয়েছে।[বাকারা : ২৮০] এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে সতর্ক করে বলছেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা বৈধ নয়। বরং কর্তব্য হলো বেচারাকে তার সুবিধামত ঋণ পরিশোধের অবকাশ দেয়া। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যাতে সে জুলুম ও নিপীড়ন থেকে বাচতে পারে।

তবে লভ্যাংশ ভোগ না করে শুধু আমানত রাখায় কোনো অসুবিধা নেই যতক্ষণ সুদী ব্যাংকের বিকল্প না পাওয়া যায়। আর সুদী ব্যাংকে চাকুরি করা চাই পরিচালক হিসেবে হোক আর হিসাব রক্ষক, রেজিস্ট্রার বা অন্য যে পদেই হোক বৈধ নয়। কারণ ইরশাদ হয়েছে- সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।[মায়িদা : ০২]

আবদুল্লাহঃ

বর্তমানে আধুনিক অর্থনীতি তথা বিশ্ব অর্থনীতিতে সুদের লেনদেন সর্বত্র। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির ফলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সুদভিত্তিক অর্থনীতির অনেক কুফল রয়েছে।

তাপশঃ

সুদভিত্তিক অর্থনীতির কুফল কি কি?

আবদুল্লাহঃ

সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির অনেক কুফল রয়েছে। তারমধ্যে কয়েকটি বলছি-

১)সমাজে শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে সুদ। একদল লোক বিনা শ্রমে অন্যের কষ্টার্জিত উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা

নেয়, সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক, তাকে সুদের অর্থ পরিশোধ করতেই হয়।

২)সুদের কারণে অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে, গরিবেরা গরিব হতে হতে একপর্যায়ে চরম অসহায়ত্বের পর্যায়ে চলে যায়। এর ফলে অনেকে আত্মহত্যা কিংবা বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ড ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

৩)সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য তথা উৎপাদন খরচ, পরিবহন খরচ, শুল্ক ও স্বাভাবিক মুনাফার ওপর উপর্যুপরি সুদ যোগ হতে থাকে। এর ফলে দ্রব্যমূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। গত শতকের চল্লিশ দশকে জার্মান বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যবিদ "জোসেফ শাখত" সুদ নিয়ে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন।সেখানে তিনি লিখেছেন - সুদের নিশ্চিত ফলাফল হলো,স্বল্প কিছু ব্যক্তির হাতে অর্থ বৃদ্ধি পাবে,যাদের সংখ্যা ধারাবাহিক কমতে থাকবে।বহু মানুষ দরিদ্র হবে,যার সংখ্যা ধারাবাহিক বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

তাপশঃ

তাহলে নিশ্চয় সুদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতির সুফল ও রয়েছে, সেগুলো কি কি একটু জানাবেন ?

আবদুল্লাহঃ

ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হচ্ছে, পুঁজি মুষ্টিমেয় লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। কারণ এর ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা চরমভাবে ব্যাহত হয়। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘ধন-ঐশ্বর্য যেন কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।’ (সুরা হাশর: ৭) ।

কিন্তু সুদের ফলে পুঁজি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবর্তিত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে একশ্রেণির মানুষের সম্পদ বিনা শ্রমে, বিনা উৎপাদনে বৃদ্ধি পেতে থাকে, আরেক দিকে গরিব মানুষেরা প্রয়োজনীয় উৎপাদনের জন্য অমানুষিক শ্রম সত্ত্বেও দিন দিন আরও গরিব হতে থাকে।ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলা

আবশ্যক, অনুরূপভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধান মেনে চলা আবশ্যক । অর্থনৈতিক জীবনে যাতে ভারসাম্য ক্ষুণ্ন না হয় এর জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে । গরীব যেন অনাহারে-অর্ধাহারে মারা না যায় সেজন্য যাকাত, উশর, খারাজ ইত্যাদির বিধান রাখা হয়েছে । এমনিভাবে ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ, জুয়া, লটারী, কালোবাজারী, মওজুদদারী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল ইত্যাদি উপার্জনের পন্থাকে হারাম করা হয়েছে । বস্তুত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কোনোরূপ যুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই । মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রে এর বাস্তবতা দেখা যায় । যে আরবের অধিবাসীরা একসময় বৈষম্য ও দারিদ্রের শিকার ছিল, ইসলামি অর্থনীতির স্পর্শে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাতে এমন পরিবর্তন সাধিত হলো যে, যাকাতের অর্থ নেওয়ার মতোও কাউকে পাওয়া যেতো না ।

[1]. মুগনি লি ইবনে কুদামা : ৬/৫৩, নাইলুল আওতার : ৬/৩৪৬-৩৫৮

[2] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=29&chapter=3726

[3] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=29&chapter=8209

[4] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=29&chapter=8210

[5] সুদমুক্ত অর্থনীতি: ডা. জাকির নায়েক

বিষয়:মিডিয়া ও ইসলাম

আবদুল্লাহঃ

তাপশ ভাই মিডিয়া সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?

তাপশঃ

কোন কিছু প্রচারে যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় সেটাই মিডিয়া। মিডিয়ার প্রধানত দু'টি স্তর রয়েছে-

(১) প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ পত্র-পত্রিকা বা সংবাদপত্র।

(২) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ স্যাটেলাইট, মোবাইল, কম্পিউটার, টিভি, রেডিও ইত্যাদি। কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার ক্ষেত্রে মিডিয়ার নিজস্ব কোন শক্তি নেই। মিডিয়ার ধারক-বাহক ও চালক যে কাজে তাকে চালাবে সে কাজেই তো মিডিয়া চলবে ও ব্যবহৃত হবে।

আবদুল্লাহঃ

আর এই মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য সন্ত্রাস ছড়ায়।

যেমন:-

১)মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম বিদ্বেষ।

২)ইসলামের উপর মিথ্যা আরোপ।

৩)মিডিয়ার প্রতারণা ইত্যাদি।

তাপশঃ

আবদুল্লাহ ভাই এই সম্পর্কে একটু ডিটেইলসে বলবেন প্লিজ।

কিভাবে তারা মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করে ?

আবদুল্লাহঃ

জ্বি অবশ্যই।আপনি নিশ্চয় শুনেছেন-

সম্প্রতি পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইসলাম আতংক ছড়িয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। আর ইসলাম আতংক ছড়িয়ে দিতে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলোই মূল ভূমিকা পালন করছে। পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমের বৈচিত্র ও আধিক্য, প্রচারণাকে আরও গতিময় করেছে।পাশ্চাত্যে বিশেষ করে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম আতংক সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ইসলাম বিরোধী অনেকগুলো চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হয়েছে। এর সর্বসাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে ফিৎনা চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইসলাম ও পবিত্র কোরআনকে অবমাননা করা হয়েছে। এছাড়া, পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো প্রতিনিয়ত কৌশলে মুসলমানদেরকে সহিংসতাকামী, পশ্চাৎপদ ও বখাটে হিসেবে তুলে ধরছে। ফিলিস্তিন,আফগানিস্তান ও ইরাকের ঘটনাবলী সম্পর্কিত খবরাখবর ও প্রতিবেদনগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই, পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো কিভাবে সত্যকে বিকৃত করছে। তারা ঘুরিয়ে-পেচিয়ে সবকিছুর জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের দায়ী হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। শুধু রেডিও, টেলিভিশনই নয় পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রগুলোও একই কাজ করছে। ইসলাম আতংক সৃষ্টির জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ ও কার্টুন প্রকাশ করছে। উদাহরণ হিসেবে ডেনমার্কের পত্রিকায় বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)-র ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসুল ও ইসলাম অবমাননাকর ঐসব কার্টুন পরে ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশের পত্রিকায় পুন:প্রকাশ করা হয়।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের গণ মাধ্যমগুলোর সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো নিজেরা সমন্বয় ও যোগাযোগের ভিত্তিতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে ইউরোপের পত্রপত্রিকায় রাসুল (সা:)-র ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডেনমার্কের একটি দৈনিকে কার্টুনগুলো প্রকাশের পরই পাশ্চাত্যের অন্যান্য পত্রিকাতেও

একযোগে ঐসব কার্টুন প্রকাশিত হয়। ইসলাম বিরোধী কোন বিষয় হলেই তারা বিভিন্ন অজুহাতে তা সব গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করে।

প্রচার মাধ্যমে ইহুদীদের আধিপত্য অতি প্রবল। রয়টারের মত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা তাদেরই। টাইম, নিউজ উইকের মত বহুল প্রচলিত পত্রিকাগুলোর প্রভাবশালী সাংবাদিক ও কলামিস্ট তারাই। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইহুদী শিক্ষকগণই অধিকতর প্রভাবশালী। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে প্রচার মাধ্যম এসব শিক্ষকদের মতামতকেই অধিকতর গুরুত্ব দেয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশাসনও নির্দেশনা নেয় তাদের থেকেই। প্রচারে ইহুদীদের প্রভাবের কারণেই ফিলিস্তীনী বসতি নির্মূলের পরও আগ্রাসী ইহুদীরা প্রচার পায় শান্তিবাদী রূপে। অথচ ইসরাঈলের জন্মই হয়েছে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে। টিকেও আছে বিরামহীন সন্ত্রাস চালিয়ে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যুদ্ধ আর সন্ত্রাস চালিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তিকে তারাই বিনষ্ট করেছে। শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয়, মার্কিনীদের পর তারাই এখন বিশ্বের বৃহৎ আগ্রাসী শক্তি। আর এদের সাফাই গাচ্ছে পাশ্চাত্যের মিডিয়া। মিডিয়ার হাতে জিম্মী পশ্চিমা বিশ্বের রাজনীতিকেরাও, ঈসরাঈলী স্বার্থের বিরোধিতা দূরে থাক তাদের স্বার্থে সামান্য নীরবতাও তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনে। মিডিয়ার আগ্রাসনের মাধ্যমে ফিলিস্তীনীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞকে তারা একটি ন্যায্য যুদ্ধ রূপে বিশ্বময় প্রচার করছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে সেটি গ্রহণযোগ্যতাও পাচ্ছে। মিডিয়া যে কিভাবে মানুষের মনের ভুবনে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এ হ'ল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এককালে বহু অর্থ ও বিপুল রক্তক্ষয়ে প্রকান্ড এক সামরিক যুদ্ধ লড়েও এমনটি সম্ভব ছিল না। আগ্রাসী শক্তি রূপে এটিই হ'ল মিডিয়ার ক্ষমতা। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আজ সে শক্তির কাছেই প্রচন্ডভাবে পরাজিত।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপকহারে অপপ্রচারে অনেক মিডিয়া লিপ্ত আছে। তন্মধ্যে ২০০টি রেডিও ষ্টেশন, ১৭০০টি টিভি চ্যানেল এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য প্রায় ২২ হাযার ম্যাগাজিন প্রতিনিয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের যুগ। তাই বিশ্বের যেকোন প্রান্তে ঘটে যাওয়া ঘটনার খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সারা দুনিয়ায়। আর এ খবর যার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তা হ'ল এই আধুনিক নিউজ মিডিয়া। ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি সহ বিশ্বের প্রধান নিউজ মিডিয়াগুলো সম্পূর্ণ ইসলাম বিদ্বেষীদের করায়ত্তে। এ কারণে প্রতিদিন ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রচার, কুৎসা রটনা ও বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে সহজ-সরল মানুষদেরকে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়া হচ্ছে।কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য মুসলিম বিশ্বের গণ মাধ্যমগুলোর মধ্যে সে ধরনের কোন যোগাযোগ ও সমন্বয় নেই বললেই চলে।

মুসলিম বিশ্বের গণমাধ্যমগুলোর আরেকটি সমস্যা হলো, তারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশনকে নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করে না এবং তাদের ইসলাম ধর্মের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করার সৎ সাহসের অভাব রয়েছে। গণমাধ্যমগুলোর দর্শক, শ্রোতা ও পাঠকরা মুসলমান হবার পরও এসব গণমাধ্যম থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি খুব একটা প্রচার হয় না। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাব থেকেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে সন্দেহপ্রবণ মানুষকে ইসলামপন্থীদের পক্ষে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাই জ্ঞান অর্জনসহ বিভিন্ন পন্থায় নিউজ মিডিয়ার যুগে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও প্রতিবাদী নিউজ মিডিয়া সৃষ্টি করলে একবিংশ শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দীতে পরিণত হবে ইনশা-আল্লাহ।

ইসলামের উপর কেনো মিথ্যা আরোপ করা হয়

ইসলাম মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। মানবতার শান্তি ও কল্যাণ সাধনের জন্যে আল্লাতালালা এমন কিছু বিষয়কে ইসলামে নিষিদ্ধ করেছেন, যেগুলো পালনের মধ্যে রয়েছে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, হতাশা, পরিবেশের বিপর্যয় ও সামাজিক অবক্ষয়ের উপাদান, অপবাদ ও অপপ্রচার তাদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর আবহমানকাল ধরে এগুলো ইসলামের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছে। যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের উপর অপবাদ ও অপপ্রচার করে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল ফায়দা নেয়ার চেষ্টা

করেছে। তারা মনে করছে যে, অপবাদ ও অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রার গতিকে রোধ করবে অথবা পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল প্রখ্যাত, বরণ্য ও বিশিষ্ট আলেম-উলামাদের উপর অপবাদ ও অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা মনে করছে যে, বিশিষ্ট আলেম-উলামাদের উপর অপবাদ ও অপপ্রচার চালালে বাংলাদেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া যাবে, এদের সাথে সূর মেলাচ্ছে তথাকথিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। তারা তিলকে তাল বানিয়ে বিভিন্ন কল্পকাহিনী তৈরি করে তাদের মিডিয়ায় প্রচার করছে। কিন্তু তাদের এ কর্মকান্ড দেশের ১৭ কোটি তৌহিদী জনতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে

ইসলাম এই সমস্ত অপবাদ ও অপপ্রচারকারীদের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে। ‘‘অপবাদ’’ গীবতের চেয়েও মারাত্মক। কোন লোকের মধ্যে যে দোষ নেই তারপ্রতি সে দোষ আরোপ করাকে অপবাদ বলা হয়। আরবীতে একে ‘‘বুহতান’’ বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি কোন গুণাহ বা নাফরমানি করলো এবং তারপর এক নিরপরাধ ব্যক্তির উপর তার অপবাদ আরোপ করলো সে এক মহাক্ষতি ও স্পষ্ট গুণাহকেই নিজের মাথায় চাপিয়ে নিল।’’ (সূরা নিসা ১১২)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, ‘‘যারা মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে কষ্ট দেয়, তারা আপন মাথায় ‘‘বুহতান’’ ও স্পষ্ট গুণাহ চাপিয়ে নিল। ’’ (সূরা আহযাব ৫৮)

অপবাদ ও অপপ্রচারকারীদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন ধ্বংস এবং তারা অভিশপ্ত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।’’ (সুরা নূর ২৩)।

নবী করিম (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন : ‘‘মুসলমানদের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ ও গুণাহ খুঁজতে থাকে, আল্লাহ তার গোপন দোষ ফাঁস করতে লেগে যান। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করতে লেগে যান, তাকে তিনি অপমান করেই ছাড়েন-সে তার ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকুন না কেন।’’ (তিরমিযী)।

কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অপবাদ ও অপপ্রচার চালানোকে ইসলাম নিষেধ করেছে এবং এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেছে।

মিডিয়ার প্রতারণা

সত্য তথ্য সঠিক জ্ঞানের উৎস। মিডিয়া বা মাধ্যম হলো তথ্যের বাহন।তথ্যপ্রাপ্তির জন্য মিডিয়া অতীব জরুরি উপকরণ।

পশ্চিমা বিশ্ব বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত প্রচার মাধ্যমের উপর একচেটিয়া প্রধান্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব স্থাপনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে গোটা মিডিয়া জগত। তথ্য বিকৃতি ও ভুল তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে বিশেষত মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করছে। নানা কায়দায় ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্ম,কৃষ্টি,সভ্যতা, ও আকীদা বিশ্বাসকে সমূলে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র লিপ্ত রয়েছে।

মুসলিম জনগোষ্ঠির ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্টার আন্দোলন ও জাগরণকে ,সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত আখ্যা দিয়ে এরা বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল চালাচ্ছে। দুনিয়ার সব কয়টি আন্তজার্তিক সংবাদ সংস্থা ও টিভি নেটওয়ার্ক ইয়াহুদী এবং পশ্চিমা জগতের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তাদের দেয়া তথ্য ও সংবাদ এবং প্রচারণার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে গোটা দুনিয়ার মানুষ। যার ফলে তারা আজ ইসলাম ও সন্ত্রাসকে একই সরলরেখায় নিয়ে এসেছে এবং দু’টোকে পরস্পরের সমর্থক হিসাবে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করে চলছে।

মিডিয়ার অব্যাহত তথ্য সন্ত্রাসের ফলে ভিন্নধর্মালম্বীরা ছাড়া খোদ কিছু মুসলমানের মধ্যে এ সংশয় দেখা দিয়েছে যে, আসলে কি ইসলাম সন্ত্রাসী ধর্ম ? মুসলমানরা কি কট্টর,গোঁড়া,জঙ্গী ও সন্ত্রাসীবাদী সম্প্রদায় ? না ইসলাম শান্তির ধর্ম।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমরা জেনে শুনে সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ো না, আর সত্যকে গোপন কর না।' (সূরা-২ বাকারা, আয়াত : ৪২)। 'কেন তোমরা জেনে শুনে সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশাচ্ছ, আর সত্যকে গোপন করছ?' (সূরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত : ৭১)।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের সূচনা করল; সে তার পাপের অধিকারী হবে এবং ওই কাজের অনুগামীদের পাপের ভাগীদার হবে। (মুসলিম)। সুতরাং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়াতে কোনো অপরাধমূলক বা গর্হিত বিষয় প্রকাশ করার আগে এ বিষয়টি চিন্তা করে অবশ্যই এর থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

[1] https://at-tahreek.com/article_details/8753

[2] https://at-tahreek.com/article_details/8810

[3] মিডিয়া এন্ড ইসলাম: ডা. জাকির নায়েক

বিষয়:সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ

সন্ত্রাসঃ

সন্ত্রাস শব্দটি ত্রাস থেকে উদ্ভূত ।

ত্রাস হলো ভয়, শংকা , ভীতিকর (সংসদ বাঙ্গালা অভিধানঃ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিতঃ কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৪,পৃষ্ঠা ৩১৭)

আর , সন্ত্রাস হলো আতন্ত্রগ্রস্ত করা , অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সন্ত্রাসিত-সন্ত্রাসযুক্ত , সন্ত্রস্ত ((সংসদ বাঙ্গালা অভিধানঃ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিতঃ কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৪,পৃষ্ঠা ৬৬১)

যারা সন্ত্রাসী করে তাদের Terrorist বলা হয় । আর সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি হলো সন্ত্রাসবাদ যাকে ইংলিশে Terrorism বলে ।

কুরানের পরিভাষায় সন্তাসিদেরকে “ মুহারিবুন” বলা হয়েছে (আল-মাআনাশ শরহে লিকারিবীন ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩)

পবিত্র কুরান ও সুন্নায় সন্ত্রাসবাদ বলতে ফিতনা এবং ফাসাদ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে ।

আল্লাহ বলেন- “ পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না “ (সূরা আরাফ, আয়াত ৫৬)

“ ফিতনা (সন্ত্রাস) নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ “ (সূরা আল-বাকারা , আয়াত ২১৭)

“ ফিতনা (সন্ত্রাস) হত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ “ (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৯১)

বিদায় হজ্জের ভাষনে রাসুল সাঃ বলেছেনঃ প্রতেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত , ধন-সম্পদ ও মান-সন্মান হারাম” (মুসলিম , ৪র্থ খন্ড , পৃষ্ঠা ১৯৮৬ , ইসলামের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল , বিদায় হজ্জের অভিভাষন অধ্যায় ,প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ ২০১১)

“ সাবধান ! ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে না । কেননা ধর্মের সঠিক বন্ধনসমূহ অতিক্রম করার ফলে তোমাদের পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে “ (ইসলামের তিনটি

গুরুত্বপূর্ণ দলিল , বিদায় হজ্জের অভিভাষন অধ্যায় ,প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ ২০১১)

দূর্ভাগ্যজনক ভাবে কিছুলোক মুসলিমদের টেরোরিস্ট বা সন্ত্রাসী আর ইসলামকে টেরোরিজম এর সমার্থক প্রচার করে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছেন । তারা ইসলামের বিধান জিহাদকে সন্ত্রাসের সাথে তুলনা করেছেন।সকল মুসলিমকে ঢালাওভাবে " সন্ত্রাসী/টেরোরিস্ট" হিসেবে আখ্যায়িত করছে ।

জিহাদ শব্দটির অপব্যখা করে দীর্ঘদিন থেকে জিহাদকে উম্মাদনার প্রতিশব্দে পরিণত করেছে । অনেকে জিহাদের নাম দিয়েছে " ইসলামী সন্ত্রাস" !

আবার কিছু মুসলিম নামধারী ব্যক্তি ,নিজ গোষ্ঠী জিহাদের অর্থকে সম্পূর্ণ বিকৃত রূপ দিয়ে শান্তির ধর্ম ইসলামকে কলুষিত করছে ।

এখন প্রশ্ন হলো , জিহাদ ও জঙ্গিবাদ তথা সন্ত্রাস কি সমার্থক? জিহাদ ও সন্ত্রাস কখোনো সমার্থক হতে পারে না । আল্লাহর বিধান পালন করতে সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে আভিধানিক ভাবে জিহাদ বলে । অন্যদিকে সন্ত্রাস হচ্ছে এমন এক নিকৃষ্ট অপকর্ম , যা মূলতঃ হত্যার চেয়েও জঘন্য হিসেবে বিবেচিত (দেখুন সুরা বাকারা , আয়াত ১৯১)

ইসলামের সত্য হচ্ছে , শান্তি প্রতিষ্ঠা , ইসলামের এই সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আড়াল করতে মিথ্যার পূজারীরা প্রতিনিয়ত চেষ্ঠা করছে । এর কারন কি ? কারন হলো " ইসলামের আলো সহজেই মানুষকে আকৃষ্ঠ করছে"

১৯৭৯ সালের ১৬ ই এপ্রিল টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি আর্টিকেল উল্লেখ করেছিল যে, বিগত দেরশ বৎসরে ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে ৬০ হাজারেরও বেশি বই লেখা হয়েছে । এছাড়াও টেলিভিশন, সিনেমা ইলেকট্রনিক গেম, ওয়েব সাইট , ব্লগ , ফেসবুক , ইউটিউব , সোশ্যাল মিডিয়ার সকল মাধ্যম ইত্যাদি অগনিত প্রচার মাধ্যমের দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল প্রপাগান্ডা চালান হয় তাঁর অন্যতম বিষয় হলো জিহাদ।

জিহাদ বিষয়ে অনেক মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালানো হয়। যেমন বলা হয়, ধর্মই সকল হানাহানির মূল, ধর্মের নামেই রক্তপাত হয়েছে সবচেয়ে বেশি । কি জঘন্য মিথ্যাচার। তবে এতা ঠিক যে, অনেক সময় ধর্মকে হানাহানির হাতিয়ার বানানো হয় । তবে ইসলাম ধর্মের নামে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ , কমুনিষ্ট চীনের সাথে কম্যুনিস্ট ভিয়েতনামের যুদ্ধ । আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ মরেছে । মম্পুচীয়ায় খেমার রূজের হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভয়ংকর মৃত্যু , জোসেফ স্টালুনের নির্দেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের হত্যা , মাওসেতুং-এর চীনে প্রায় দু কোটি মানুষের হত্যা , মুসোলিনির নির্দেশে ইটালির ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও এরূপ অগনিত মানুষের হত্যা কোন ইসলামের নামে হয়েছে?

তারা বলছে , একমাত্র ইসলাম ধর্মই জিহাদের কথা বলেছে । কি মিথ্যা কথা !! হিন্দুদের মহাভারত ও রামায়ন পুরোটা যুদ্ধ নিয়ে । গীতার যুদ্ধের নির্দেশ রয়েছে । বাইবেলে বারংবার যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইবেলার যিশুখৃস্ট তাঁর সকল শত্রুকে ধরে ধরে জবাই করতে নির্দেশ দিয়েছেন (বাইবেলঃ লুক ১৯/২৭) । যুদ্ধে উধবুদ্দ করে তিনি বলেন , আমি তরবারী নিয়ে এসেছিঃ Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace , but a sword (বাইবেলঃ মথি ১০/৩৪)।

বাইবেলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে বেসামরিক মানুষ হত্যা, বাড়িঘর কৃষিক্ষেত ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো দেশ যুদ্ধ করে দখল করতে পারলে তাঁর সকল পুরুষ অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে এবং নারীদের ভোগের জন্য রাখতে হবে । আর সে দেশ যদি ইহুদীদের বসবাসের কোনো দেশ হয় তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রানী হত্যা করতে হবে । (বাইবেল, গননাপুস্তক ৩১/১৭-১৮; দ্বিতীয় বিবরন ২০/১৩-১৬)

বাইবেলের যিহোশূয়ের পুস্তক , বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরন , শমুয়েলের পুস্তক , রাজাবলির , বংশাবলি ইত্যাদি পাঠ করলে বর্বর গনহত্যা , কল্পনাতীত নিপিড়ন , উন্মাদ ধবংশযজ্ঞের লোমহর্ষক ঘটনাবলি দেখা যায়।

যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়াতে ক্রুসেড (Crusade) , এলবিজেনসিয়ান ক্রুসেড ,সেন্ট বার্থলমিউস দিবসের গণহত্যা (Massacre of saint Bartholomew's Day) , ইনকুইজিশন , ধর্মের যুদ্ধ ইত্যাদি আর্টিকেল পড়লেই অনেক তথ্য জানা যায়। যদিও আধুনিক এনসাইক্লোপিডিয়াতে বিষয়গুলিকে খুবই হালকা করা হয়েছে এবং নিহতদের সংখ্যা কম করা হয়েছে , তবুও যেটুকু সত্য দেখা যায় তাতেই গায়ের লোম শিউরে উঠে! এ হলো ইহুদী – খৃস্টানদের একেকটি ধর্মযুদ্ধের অবস্থা । মহাভারত , গীতা ও রামায়ণের যুদ্ধেরও কাছাকাছি অবস্থা ।

ইসলামের জিহাদ নিয়ে আরেকটি বিভ্রান্তি হলো , মুসলিমরা ধর্মপ্রচার বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে বা ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে । এটি মিথ্যা ও প্রকৃত সত্যের সম্পুর্ন বিপরীত তথ্য। বস্তুত বাইবেলে ধর্মের কারনে মানুষ হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বারংবার বিধর্মীদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলার , দেশের বিধর্মী নাগরিকদের দাওয়াতের নামে ডেকে এনে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করার ও নিরিহ বিধর্মীদের ধরে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (বাইবেল, ১ রাজাবলি ১৮/৪০,২ রাজাবলি ১০/১৮-২৮) । ৩২৫ খৃস্টাব্দে বাইযেন্টাইন সম্রাট কনস্টান্টাইন খৃস্টধর্মকে রাস্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন । সেদিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত খৃস্টান চার্চ, পোপ, প্রচারক ও রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস হলো রক্তের ইতিহাস । অধার্মিকতা বা heresy দমনের নামে , ধর্ম প্রচারের নামে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা , পরধর্মের প্রতি বিষোদগার , জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ , অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা , নির্যাতন বা জিবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা খৃস্টান ধর্মের সুপরিচিত ইতিহাস ।

পক্ষান্তরে ইসলামে শুধু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্যই যুদ্ধ বৈধ করা হয়েছে , ধর্ম প্রচারের জন্য নয় । ইসলামে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনোই অমুসলিম হওয়ার কারনে কাউকে হত্যা করা হয়নি বা জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর চেষ্টা করা

হয়নি । আল্লাহ বলেন- " ধর্মের মধ্যে কোনো জোর যবরদস্তি নেই " (সূরা বাকারা , আয়াত ২৫৬)

রাসুল সাঃ বলেন- " যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না , যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দূরত্ব থেকে লাভ করা যায় " (বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৫৫ , ৬/২৫৩৩; মুসলিম , আস-সহীহ ৪/২২৭৮)

যুইশ এনসাইক্লোপিডীয়া ও অন্য যে কোনো ইতিহাস বা বিশ্বকোষ থেকে জানা যায় যে, বিগত দেড় হাজার বছরে ইউরোপের সকল খৃস্টান দেশে ইহুদিদের উপর বর্বর অত্যাচার করা হয়েছে , জোর পূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে , নানাভাবে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে । অথচ এ সময়ে মুসলিম দেশগুলিতে ইহুদীরা পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছে । আজ এ বর্বরতার অনুসারী ও উত্তরসূরীরা তাদের বর্বরতা ঢাকতে ইসলামের জিহাদকে সন্ত্রাস বলে অপ-প্রচার চালাচ্ছে।

দেড় হাজার বছর ধরে মুসলিমগণ আরববিশ্ব শাসন করেছেন । সেখানে দেড় কোটিরও বেশি খৃস্ট্রান ও কয়েকলক্ষ ইহুদী এখন পর্যন্ত বংশপরম্পরায় বসবাস করছে ।

ভারতে মুসলিমগণ প্রায় একহাজার বছর শাসন করেছেন , সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ জন হিন্দু । অথচ খৃস্ট্রানগন যে দেশই দখল করেছেন, জোর যবরদস্তি করে বা ছলে বলে সে দেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছেন অথবা হত্যা ও বিতাড়ন করেছেন ।

ইসলাম যদি তরবারির জোরেই প্রচারিত হবে তাহলে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিমপ্রদান দেশ হয় কি করে ? সেখানে তো কোনো মুসলিম বাহিনী কখনোই যায় নি । বিগত অর্ধ শতাব্দি যাবৎ ইসলাম হলো সর্বাধিক বর্ধনশীন ধর্ম । ইউরোপ আমেরিকা সহ সকল দেশের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহন করছে । কোন তরবারীর ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহন করছেন?

সন্ত্রাসবাদ কি?

সন্ত্রাসবাদ হল সন্ত্রাসের পদ্ধতিগত ব্যবহার যা প্রায়শই ধ্বংসাত্মক এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঘটানো হয়। যদিও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের কোন বেধে দেওয়া সীমারেখা অথবা সঙ্গায়ন নেই। সন্ত্রাসবাদ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের কাছে একই বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে,তা নির্ভর করে সেই জনগোষ্ঠী বা রাস্ট্র নিজেদের লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করছে কিনা সন্ত্রাসবাদকে।উদাহরণস্বরূপ-

আল-মাওসুআহ আল-আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইরহাব (সন্ত্রাস) হচ্ছে ভীতি সঞ্চারের জন্য বল প্রয়োগ করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা। 'রাবিতাতুল আলামিল ইসলাম' পরিচালিত 'ইসলামী ফিকহ কাউন্সিল' ১৪২২ হিজরিতে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৬তম অধিবেশনে সন্ত্রাসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করে- 'কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র কোনো মানুষের ধর্ম, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ ও সম্মানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে।' এ সংজ্ঞা সব ধরনের নীতিবর্হির্ভুত ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন, ক্ষতিসাধন, অন্যায় ও বিচারবহির্ভূত হত্যা, অপরাধমূলক হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে একক ও সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত যেকোনো ধরনের অন্যায় কর্ম, সশস্ত্র হামলা, চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রাহাজানি, ভীতিকর ও হুমকিপূর্ণ কাজ এবং লোকজনের জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এমন কর্মকাণ্ডকে শামিল করে। তা ছাড়া পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করাও সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য হবে।

সন্ত্রাসের প্রকারভেদ

Terrorism বা সন্ত্রাসকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকে সন্ত্রাসকে তিনভাগে ভাগ করেছেন:

(1)Revolutionary Terrorism
(2) Sub Revolutionary Terrorism
(3) Establishment Terrorism

প্রথম প্রকার (Revolutionary Terrorism) বা বৈপবিক সন্ত্রাস অর্থ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে সেখানে অন্য একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইটালীর রেড ব্রিগেড, জার্মানীর রেড আর্মি (বাদের মেইনহফ), বাস্ক বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ (ইটিএ), পেরুর শাইনিং পাথ ইত্যাদি অগণিত উদাহরণ রয়েছে এ জাতীয় সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিলূপ্তি না ঘটিয়ে সহিংসতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমাসীনদের সরিয়ে আংশিক পরিবর্তনের জন্য যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয় তাকে (Sub Revolutionary Terrorism) বিপ্লবেতর সন্ত্রাস বলা হয়। অনেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কর্মকান্ডকে এর উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন। আয়ারল্যান্ডের আই. আর. এ.-কেও এ পর্যায়ে ফেলা যায়।

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বা রাষ্ট্র পরিচালিত সন্ত্রাসকে (Establishment terrorism) প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস বা (state or state sponsored terrorism) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলা হয়। অনেক সময় সরকার বা সরকারের কোনো সংস্থা তারই নাগরিকদের, অথবা সরকারের মধ্যকার কিছু মানুষদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য দেশের সরকার বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এ জাতীয় সন্ত্রাস খুবই ব্যাপক, কিন্তু চিহ্নিত করা কঠিন। কারণ কোনো রাষ্ট্রই সাধারণত নিজের সন্ত্রাসী

কর্মকান্ড বা এ ধরনের কর্মকান্ডে তার সমর্থন প্রকাশ করে না বা স্বীকার করে না। শীতল যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার সমর্থক দেশগুলি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করেছে। অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এঙ্গোলার (UNITA) বিদ্রোহীদের সমর্থন ও তাদের সাথে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণসহ সারা বিশ্বে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করেছে এবং করছে।

জিহাদ কি?

জিহাদ (আরবি: جهاد), যার অর্থ সংগ্রাম; কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করাকে বোঝানো হয়। এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম,সাধনা,কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। তবে সচরাচর ইসলামী পারিভাষিক অর্থে 'জিহাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লড়াই যখন আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রাসুলের জন্য ও তাঁর দীনের জন্য হয় এবং তা সেই পন্থায় হয়, যা শরিয়াহ নির্দেশিত বা শরিয়াহ অনুমোদিত তখন সেটাকে জিহাদ বলা হয়।

আর লড়াই যখন আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর দীনের জন্য না হয়ে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হয় এবং তা শরিয়াহ নির্দেশিত বা শরিয়াহ অনুমোদিত পন্থায় না হয়ে অন্য কোনো পন্থায় হয় তখন সেটাকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বলে।সুতরাং জাতীয়তাবাদ রক্ষার লড়াই, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই, অনৈসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃতির লড়াই ইত্যাদি সবই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। একইভাবে জিহাদের নামে মুসলিম জনসাধারণকে টার্গেট করে হামলা চালানো, উম্মাহর আলিম ও মুজাহিদদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। আর আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে পরিচালিত শরিয়াহ নির্দেশিত বা অনুমোদিত আগ্রাসী বা প্রতিরোধমূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টাই হলো প্রকৃত জিহাদ।

যারা জিহাদ ও সন্ত্রাসকে মিলিয়ে ফেলে, তারা নিরেট অজ্ঞ ও মূর্খ বৈ কিছু নয়। যারা সন্ত্রাসকে জিহাদ বলে বা জিহাদকে সন্ত্রাস বলে, তারা সবাই ইসলাম ও মুসলিম

উম্মাহর দুশমন। আর যারা সন্ত্রাস প্রতিরোধের স্বার্থে জিহাদের সংজ্ঞাকেই আমূল বিকৃত করে উপস্থাপন করে, তারা মুলহিদ, মুনাফিক ও জিন্দিক।

সন্ত্রাসবাদ এবং জিহাদের মধ্যে পার্থক্য

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ কখনো এক নয়। জিহাদ একটি ইবাদত। এর রয়েছে কিছু মহান উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসবাদ বা অন্যান্য যুদ্ধ কখনো ইবাদত নয়। বরং তা হারাম কাজ। আল্লাহর বিধান পালন করতে সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে আভিধানিক ভাবে জিহাদ বলে ।

জিহাদ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার আগে দেখি জিহাদ সম্পর্কে রাসুল সাঃ কি বলেছেন –

“সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো জালিম শাসক বা প্রশাসকের কাছে ইনসাফের কথা বলা” (তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪৭১; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/১২৪;ইবনু মাজাহ আস-সুনান ২/১৩২৯ । হাদিসটি হাসান ।)

“যে নিজ প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে সে মুজাহিদ”(তিরমিযী,,আস-সুনান ৪/১৬৫,হাকিম,আল-মুসতাদরাক ১/৫৪। হাদীসটি সহীহ)

“ কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণ ওযূ করা, বেশি বেশি মসজিদে গমন করা এবং এক সালাতের পরে অন্য সালাতের অপেক্ষা করা , এই হলো জিহাদের প্রহরা “ (মুসলিম, আস-সহীহ ১/২১৯)

এই সকল হাদিস ছাড়াও আল্লাহর রাসুল সাঃ পিতামাতার খেদমতকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন । (বিস্তারিত জানতে দেখুন , বুখারী , আস-সহীহ ৩/১০৯৪, ৫/২২২৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৫)

অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিত জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে দায়ী করেন। এদের মধ্যে কেউ মনে করেন, ইসলামে অনেক ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহ-অবস্থান সম্ভব। তবে ইসলামের মধ্যে ভাল বিষয়ের সাথে জিহাদ, ধর্মত্যাগ, বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ক কিছু উগ্র ও

অসহিষ্ণু বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেগুলি মানবাধিকার বা সভ্যতার সহঅবস্থান বা বিকাশের বিপক্ষে। এ সকল শিক্ষা থেকেই জঙ্গিবাদের জন্ম। এজন্য জঙ্গিবাদ দমনের জন্য ইসলামের 'ভাল শিক্ষাগুলির' প্রসংশা করতে হবে ও সেগুলির বিকাশ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি উগ্র বা 'খারাপ' শিক্ষার বিস্তার রোধ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। এ থেকে 'উগ্রতা'-র উৎসাহ দিতে পারে এরূপ শিক্ষা বাদ দিতে হবে।

এভাবে মুসলিম সমাজগুলিতে 'মডারেট' মুসলিমদের উত্থান ঘটাতে পারলেই জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। অন্য অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিত মনে করেন বা দাবি করেন যে, ইসলামের মূল শিক্ষাই ''জঙ্গি''। তাদের মতে, ইসলাম তার অনুসারীদের অসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। ইসলামে জিহাদের নামে অমুসলিমদেরকে হত্যা করার উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে। আর এর ফলেই মুসলিমদের মধ্যে জঙ্গিবাদের উত্থান। তাদের মতে ইসলামী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বন্ধ করার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মকে নির্মুল অথবা নিয়ন্ত্রণ করা। এরা দাবি করেন যে, ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত আবশ্যম্ভাবী। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের উত্থান 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের সঠিকত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ইহূদী-খৃস্টান ধর্মগুরু ও ধর্মীয় উগ্রবাদীরাই শুধু নয়, পাশ্চাত্যের অনেক ''ধর্মনিরপেক্ষ'' রাষ্ট্রনেতা বা রাজনৈতিক নেতাও বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম ও সন্ত্রাস সমার্থক এবং ইসলামকে প্রতিরোধ করাই সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করা। অনেকে চক্ষু লজ্জায় বা 'ডিপে–ামম্যটিক-রাজনৈতিক' প্রয়োজনে তা সরাসরি বলেন না। তারা বলেন না যে 'ইসলামের বিরুদ্ধে' যুদ্ধ করতে হবে, বরং বলেন, 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু অনেকেই মনের কথাটি বলে ফেলেন, তাঁরা 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' বিরুদ্ধে নয়, বরং 'ইসলামের' বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে ডেনমার্কের রানী এক বিবৃতিতে বলেন:

We are being challenged by Islam these years- globally as well as locally. It is a challenge we have to take seriously... We have to

show our opposition to Islam and we have to, at times, run the risk of having unflattering labels placed on us because there are some things for which we should display no tolerance.

“বর্তমান বছরগুলিতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে এবং স্থানীয়ভাবে ইসলামের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছি। এ চ্যালেঞ্জকে আমাদের কঠিনভাবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের প্রতি আমাদের বিরোধিতা আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে এজন্য আমাদেরকে অপ্রশংসনীয় বদনাম গ্রহণের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হবে। (ইসলামের প্রতি বিরোধিতা বা বিদ্বেষ প্রকাশের কারণে

সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, বর্ণবাদী ইত্যাদি খারাপ বিশেষণে ভূষিত হওয়ার ঝুঁকিও মেনে নিতে হবে।) কারণ কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়ে আমাদের কোনো নমনীয়তা বা সহনশীলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। (ইসলাম অনুরূপ বিষয় যার প্রতি কোনোরূপ সহশীলতা প্রদর্শন করা যাবে না, যদিও তাতে আমাদেরকে উগ্র, মৌলবাদী বা অনুরূপ কিছু বলা হয়।)”![6]

এরা মনে করেন, মানব সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়, শক্তির মাধ্যমে বিশ্বের সকল মুসলমানকে হত্যা করা, বন্দী করা, জোরপূর্বক খৃস্টান বানানো ও মুসলিম দেশগুলিকে সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষত, ইসলামী শিক্ষার বিস্তার রোধ করা।

বর্তমানে আমরা পত্রপত্রিকায় প্রতিনিয়তই দেখতে পাই যে, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ (?) রাজনীতিবিদ তাদের দেশগুলিতে মসজিদ তৈরি নিষিদ্ধ করতে, মুসলিমদের নাগরিকত্ব প্রদান বন্ধ করতে বা বহিষ্কার করতে সরকারের নিকট প্রকাশ্যে দাবি দাওয়া তুলছেন। উপরন্তু এ সকল দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে তারা নির্বাচনে ভাল ভোটও লাভ করছেন। এছাড়া এরূপ অনেক পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ (?) রাজনৈতিক নেতা দাবি করছেন যে, ইউরোপে বা আমেরিকায় যদি কোনো সন্ত্রাসী হামলা হয় তবে নিশ্চিত ধরে নিতে হবে যে, মুসলিম সন্ত্রাসীরাই তা করেছে এবং এর জবাবে

ক্ষেপনাস্ত্রের মাধ্যমে মক্কা-মদীনা ধ্বংস করে দিতে হবে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ও প্রভাশালী চিন্তাবিদ ও লেখিকা অ্যান কালটার (Ann Coulter) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের জন্য সকল মুসলিম দেশ দখল করে মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার দাবি জানিয়ে লিখেন: "we should invade their countries, kill their leaders and convert them to Christianity." "আমাদের উচিত তাদের দেশগুলি আক্রমন করা, তাদের নেতাদেরকে হত্যা করা এবং ধর্মান্তরিত করে তাদেরকে খৃস্টান বানানো।"

এ সকল গবেষক-পন্ডিতকে হয়ত মুসলিমগণ 'ইসলাম-বিদ্বেষী' বলে মনে করতে পারেন, তবে এদের অনেকের ক্ষেত্রেই এরূপ মতপ্রকাশের জন্য বিদ্বেষের চেয়ে অজ্ঞতাই বড় কারণ। এরা দেখছেন যে, কোনো কোনো মুসলিম নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করছে এবং এজন্য তারা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করছে। কাজেই তাঁরা ধারণা করেন যে, কুরআন এরূপই শিক্ষা দিয়ে থাকে। এদের অনেকেই ইসলামের জিহাদ বিষয়ক কিছু নিদের্শ হয়ত পাঠ করেছেন, কিন্তু জিহাদের প্রকৃত অর্থ, শর্ত বা বিধানাবলি জানেন নি। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম ধর্ম-প্রচারক বা ধর্মগুরুদের প্রচারণামূলক বইপুস্তকই পাঠ করেছেন, ইসলামী জ্ঞানের সূত্রগুলি থেকে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন নি। বিশেষত ইসলাম বিদ্বেষী অপপ্রচারের জোয়ারের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ বা যাচাই করা অনেকের জন্যই খুব কঠিন কর্ম। এজন্য প্রচলিত প্রচারের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, জঙ্গিবাদের জন্য ইসলামই দায়ী এবং ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করাই এ সমস্যা দূরীকরণের একমাত্র উপায়।

মুসলমানের সন্ত্রাসের জন্য তার ধর্ম ইসলামকে অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বিশ্বের সর্বত্র ও সকল জাতির মধ্যেই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে। অন্য কোনো ধর্মের সন্ত্রাসীর সন্ত্রাসের জন্য তার ধর্মকে কখনোই দায়ী করা হয় না। কিন্তু মুসলিমের সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে ঢালাওভাবে দায়ী করা হয়। আসাম, মনিপুর, মিজোরাম, বিহার, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স বা অন্য কোনো স্থানের হিন্দু,

খৃস্টান, বৌদ্ধ, ক্যাথলিক, প্রটেসট্যান্ট বা অন্য ধর্মের সন্ত্রাসীদের বিষয়ে তাদের ধর্ম উল্লেখ করা হয় না বা ধর্মকে দায়ী করা হয় না। তাদের দেশ বা জাতির পরিচয় দিয়ে বলা হয় আইরিশ, তামিল, মনিপুরী, আসামীয়, বাস্ক, ইটালীয়, স্পেনীয় বা জার্মান সন্ত্রাসী। কিন্তু কোথাও কোনো মুসলিম এরূপ করলে তার ধর্মকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, ফিলিপাইন, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা কাশ্মীরের ইসলামী বা মুসলিম সন্ত্রাসী...। অথচ সকল ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসের কারণ ও দাবী একই। সকলেই তাদের ধারণা অনুসারে অধিকার রক্ষার সাধারণ পথে ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাসের পথ ধরে এবং সকলেই সন্ত্রাসের বৈধতা ও অনুপ্রেরণার জন্য নিজেদের ধর্মের বাণী ও শিক্ষা ব্যবহার করে। শুধু ধর্মাবলম্বীদের সন্ত্রাসই নয়, একান্তই ধর্মের নামে ও ধর্মের জন্য হত্যা, গণহত্যা ও সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা রয়েছে, যেগুলিতে কখনোই ধর্মকে দায়ী করা হয় না, বরং সন্ত্রাসে লিপ্ত মানুষদেরকে দায়ী করা হয়। সামান্য একটি তালিকা দেখুন:

(১) ধর্মের নামে ও একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায় ইউরোপের খৃস্টানগণ বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে চার্চের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে এবং কখনো কখনো খৃস্টান শাসকদের নির্দেশে বিভিন্নভাবে নিরস্ত্র সাধারণ ইহূদীদেরকে নির্যাতন ও হত্যা করেছেন। এর মধ্যে অনেক ‘‘গণহত্যা’’র ঘটনা রয়েছে যেগুলিতে একসাথে হাজার হাজার ইহূদীকে হত্যা করা হয়। সর্বশেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫) হলোকস্ট (holocaust) এ প্রায় ৬ মিলিয়ন ইহূদী নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

(২) একান্ত ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের খৃস্টানগণ স্পেনে ও ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার অযোদ্ধা নিরস্ত্র মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে চরম বর্বরতার সাথে হত্যা করেছে। এর মধ্যে অনেক গণহত্যার ঘটনা রয়েছে। সর্বশেষ ঘটনা বসনিয়ায় (Bosnia and Herzegovina) সার্ব খৃস্টানগণ কর্তৃক মুসলিম হত্যাযজ্ঞ। এ হত্যাযজ্ঞের অনেক ঘটনার মধ্যে অন্যতম স্রেব্রেনিসায় (Srebrenica) গণহত্যা। একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ ও জাতিগত প্রতিহিংসার ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত নিরাপদ আশ্রয়ে জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী

বাহিনীর নাকের ডগায় ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে সার্ব খৃস্টানগণ স্রেব্রেনিসায় ৮,০০০ নিরস্ত্র অযোদ্ধা মুসলিম যুবক, কিশোর ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সর্বোপরি এ গণহত্যার বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাথমিক ঠান্ডা প্রতিক্রিয়ার কারণ বোধহয় একমাত্র এ-ই যে, ঘাতকগণ ছিল খৃস্টান আর নিহতরা ছিল মুসলমান। এ বিষয়ে এনকার্টার (The Bosnian War Crimes Investigations) রিপোর্টে বলা হয়েছে: Although the ICTY's inquiry focuses on war crimes committed by the warring parties within Bosnia, it has also raised serious questions among human rights observers about the role of the United States and other Western powers. Specifically, did U.S. intelligence agencies have advance knowledge of the Bosnian Serb attack on Srebrenica and fail to warn the United Nations (UN) forces guarding the city? Why were the U.S. and other Western intelligence agencies slow in releasing evidence of Bosnian Serb war crimes during the nearly four-year-long conflict? And why have Western officials in charge of enforcing the peace accord failed to arrest the two men indicted by the ICTY for masterminding the Bosnian Serb campaign of *ethnic cleansing*—the organized program of mass murder, rape, and destruction of homes and places of worship? "যদিও আই.সি.টি.ওয়াই (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) -এর তদন্ত মূলত বসনিয়ার যুদ্ধরত পক্ষগুলির যুদ্ধপরাধ উদ্ঘাটনের জন্য, তা সত্ত্বেও এ ট্রাইবুনাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মধ্যে গুরুতর কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। বিশেষত, স্রেব্রেনিসায় সার্বদের আক্রমন সম্পর্কে অগ্রিম কোনো তথ্য কি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে ছিল? তা সত্ত্বেও কি তারা এ শহর রক্ষায় নিয়োজিত জাতিসঙ্ঘ বাহিনীকে সে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল? প্রায় চার বছর দীর্ঘ সংঘাতের সময়ে বোসনিয়ায়

সার্বদের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক তথ্যপ্রমাণাদি প্রকাশ করতে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এমন ধীরতা অবলম্বন করল কেন? যে সকল পশ্চিমা কর্মকর্তা শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন তারা এ গণহত্যা, গণধর্ষণ ও বাড়িঘর ও উপাসনালসমূহের ধ্বংসযজ্ঞের মূল পরিকল্পনাকারী নায়ক হিসেবে আইসিটিওয়াই যে দু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছিল তাদেরকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলেন কেন?"

(৩) ২০০২ সালে গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তা জঙ্গি হিন্দুরা প্রায় দুই হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে, হাজার হাজার মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করা হয় ও হাজার হাজার মুসলিম নাগরিকদের বাড়িঘর ও সম্পদ লুট করা হয়।

(৪) ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের অন্যতম ঘটনা আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (IRA)) সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। বৃট্রিশদের সাথে আইরিশদের শত্রুতা ও বিরোধিতার মূল উৎস ধর্ম। বৃটিশগণ প্রটেস্ট্যান্ট ও আইরিশগণ ক্যাথলিক। ইউরোপের ইতিহাসে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যকার ভয়ঙ্কর যুদ্ধগুলি ছাড়াও অনেক গণহত্যার ঘটনা সুপরিচিত। তারই অংশ হিসেবে এ দু দেশের মানুষের মধ্যে শতশত বছরের পুঞ্জিভুত বিদ্বেষের একটি প্রকাশ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া।

লক্ষণীয় যে, উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্টগণ সর্বদা বৃটিশ শাসনের পক্ষে থেকেছে আর আই. আর. এর সন্ত্রাস পরিচালিত হয়েছে অনেক সময় এ সকল আইরিশ প্রটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে। বিশেষত ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আইআরএর গুপ্তহত্যা, বোমা হামলা, গাড়ি বোমা, বাণিজ্যিক কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে শতশত বেসামরিক নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশু নিহত হয়েছেন এবং অগণিত মানুষ আহত হয়েছেন।

(৫) ধর্মভিত্তিক ও ধর্মীয় সন্ত্রাসের অন্যতম উদাহরণ যায়নবাদী (Zionist) ইহূদীদের সন্ত্রাস। ফিলিস্তিনে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এরা অগণিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত

হয়েছে। ধর্মের নামে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাস করে তারা অগণিত নিরস্ত্র মানুষ হত্য কারেছে এবং গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছে। এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে কিং ডেভিড হোটেল উড়িয়ে দেওয়া ও দির ইয়াসিন নামক গ্রামের নিরস্ত্র নিরীহ মানুষদের গণহত্যা।

মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে ২২ জুলাই ১৯৪৬ সালে জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে বোমা হামলা চালিয়ে ইরগুন যাভি লিয়াম (the Irgun Zvai Le'umi: National Military Organization) নামক ইহূদী সন্ত্রাসী জঙ্গি সংগঠন নিরস্ত্র শিশু ও মহিলা সহ আরব, বৃটিশ ও ইহূদী শতাধিক নিরস্ত্র অযোদ্ধা মানুষকে হত্যা করে এবং আরো অনেক মানুষ আহত হয়।

এনকার্টা এনসাইক্লোপীডিয়ার এ ঘটনাকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ-জমকালো সন্ত্রাসী ঘটনা (The most spectacular terrorist incident) এবং বিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম সন্ত্রাসী ঘটনা (the most deadly terrorist incidents of the 20th century) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সন্ত্রাসী মেনাহেম বেগিন পরবর্তীকালে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে এবং তাকে শান্তি তে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে।

দির ইয়াসিনের বর্বর হত্যাকান্ডের নিন্দাজ্ঞাপন করে আলবার্ট আইনস্টাইন এবং ১৮ জন বিশিষ্ট ইহূদী নিউইয়র্ক টাইমসে চিঠি লিখেন ৪ ডিসেম্বর ১৯৪৮। এ চিঠিতে তারা বলেন: ''আরব গ্রাম দির ইয়াসিন-এ তাদের (মেনাহেম বেগিন ও তার দলের) আচরন এ পার্টির নির্মমতার এক হৃদয় বিদারক দৃষ্টান্ত। প্রধান সড়ক থেকে দূরে ইহূদী ভূমি বেষ্টিত এই গ্রামবাসী কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নি বরং আরর গোষ্ঠীরা যারা এই গ্রামকে তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তাদের তারা তাড়িয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসী দল ৯ এপ্রিল এই শান্তিকামী গ্রামবাসীর উপর আক্রমন করে। এরা কোনোভাবেই যুদ্ধের প্রয়োজনে কোনো সামরিক লক্ষ্য ছিল না। এই হামলায় গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী (২৪০ জন) নিহত হন, এবং জেরুজালেমের রাস্তায় বন্দী হিসেবে হটিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। ... সন্ত্রাসীরা এই বর্বরোচিত ঘটনার জন্য লজ্জিত হওয়া তো দূরের কথা, এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় তারা গর্ববোধ

করে ও এটি ব্যাপকভাবে প্রচার করে এবং দেশে উপস্থিত সকল বিদেশী সংবাদ সংস্থাকে দির ইয়াসিন-এ তাদের কৃত ধ্বংসযজ্ঞ ও লাশের স্তুপ দেখার আমন্ত্রণ জানায়।"[9]

এরূপ ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের অগণিত উদাহরণ আমরা সমকালীন ইতিহাসে দেখতে পাই। এ সকল ঘটনাকে সন্ত্রাসী ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা বলে অনেকে স্বীকার করেছেন ও করছেন। কিন্তু কখনোই এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য সন্ত্রাসীদের ধর্মকে দায়ী করা হয় নি। যদিও এ সকল সন্ত্রাসী কর্ম একান্তই ধর্মীয় প্রেরণায়, ধর্মীয় বিদ্বেষে বা ধর্মগ্রন্থের বাণীকে ভিত্তি করে করা হয়েছে, তবুও কখনোই তাদের বিষয়ে খৃস্টান সন্ত্রাসী, ক্যাথলিক সন্ত্রাসী, প্রটেস্ট্যান্ট সন্ত্রাসী, অর্থোডক্স সন্ত্রাসী, হিন্দু সন্ত্রাসী, ইহূদী সন্ত্রাসী বা অনুরূপ কিছু বলা হয় না। বরং তাদের জাতি, গোষ্ঠী বা অন্যান্য পরিচয়কে তুলে ধরা হয়। সর্বোপরি কখনোই তাদের সন্ত্রাসী বা মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য তাদের ধর্মকে দায়ী করা হয় না।

সন্ত্রাস উদযাপনও করা হচ্ছে। ১৯৪৬ সালে কিং ডেভিড হোটেলের এ সন্ত্রাসী ঘটনার ৬০ বর্ষপূর্তি ইস্রাইলে ঘটা করে উদযাপন করা হয়। ২০০৬ এর জুলাই মাসে ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রশাসন ও জনগণ এ সন্ত্রাসী ঘটনার ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে "জয়ন্তী" উৎসব পালন করে। এ বিষয়ে ভারতের জাতীয় দৈনিক 'দি হিন্দু'র ২৪/৭/২০০৬ তারিখের অনলাইন সংস্করণে "সন্ত্রাস উদযাপন: ইসরাইলী স্টাইল (Celebrating Terror, Israeli-style) প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[10]

কিতালঃ

জিহাদের একটি বিশেষ পর্যায় হলো কিতাল । কিতাল অর্থ পারস্পরিক হত্যা বা যুদ্ধ।

ইসলামী পরিভাষায় কিতালকেও জিহাদ বলা হয়।পারিভাষিক ভাবে কিতাল হলো সেই জিহাদ যেখানে শত্রুরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ । জিহাদ "ধর্মযুদ্ধ" বা "পবিত্র যুদ্ধ" নয় বরং এর অর্থ "রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ" ।

জিহাদের শর্তঃ

জিহাদ বা রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের জন্য চারটি শর্ত আছেঃ

১) জিহাদের প্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব । রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পূর্বে , ইসলাম জিহাদের অনুমতি প্রদান করে নি । রাসুলুল্লাহ সাঃ সম্পুর্ণ শান্তপূর্ণভাবে ধর্ম প্রচার বা দাওয়াতের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যান এবং এভাবে এক পর্যায়ে মদীনা শরীফের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহন করেন এবং রাসুল সাঃ কে তারা তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহন করেন । এভাবে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় । কাফিরগণ এ রাষ্ট্রটিকে গলাটিপে মেরে ফেলার জন্য চারিদিক থেকে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় । তখন আল্লাহ যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করে বলেনঃ " যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারন তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।" (সুরা হজ্জ ২২: আয়াত ৩৯) এ আয়াত থেকেই আমরা জিহাদের ২য় শর্ত জানতে পারি।

২) জিহাদের দ্বিতীয় শর্ত হলো আক্রান্ত বা অত্যাচারিত হওয়া । যখন মুসলিম রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের নাগরিকগণ অন্য কোনো আক্রান্ত বা অত্যাচারিত হবেন অথবা এরূপ হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রকাশিত হবে তখনই কিতাল বৈধ হবে ।

৩)জিহাদের তৃতীয় শর্ত হলো রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ও নেতৃত্ব । কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জিহাদের ঘোশনা বা অনুমতি প্রদান করতে পারবে না । এ বিষয়ে রাসুল সাঃ বলেন- " রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ঢাল , যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে" (বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭১)

৪) জিহাদের চতুর্থ শর্ত হলো , শুধু সশস্ত্র শত্রুযোদ্ধাকের সাথেই যুদ্ধ করতে হবে । এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন-" তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো তাদের সাথে যারা তমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না , আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীগনকে ভালোবাসেন না " (সূরা বাকারা ২: আয়াত ১৯০)

এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা , অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় বা গোষ্ঠীয় সকল সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছেন । এমনকি যোদ্ধা টার্গেটের বিরুদ্ধে সীমালঙ্গন নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।

রাসুল সাঃ বলেন- " যুদ্ধে তোমরা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রানীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসন্মান করবে না , কোনো শিশু কিশোরকে হত্যা করবে না , কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না , কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মজাযককে হত্যা করবে না , কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না , কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না , কোনো জনপদ ধবংশ করবে না , খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু , উট বা কোন প্রানী বদ করবে না , যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোন গাছ কাটবে না ..... " (বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৯/৯০)

ইসলামে মানুষ হত্যা করা কঠিনতম পাপ। একটি মানুষের জীবন বাচাতে যেমন তাঁর কোনো অঙ্গ সার্জারির মাধ্যমে কেটে ফেলতে হয় , তেমনি মানব সমাজকে বাঁচাতে একান্ত বাধ্য হয়ে দুটি পথে মানুষ হত্যার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে ।

১) বিচারের মাধ্যমে

২) যুদ্ধের ময়দানে

এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো যথা সম্ভব হত্যা পরিহার করা ।

জিহাদের শর্তগুলি পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদের নামে অস্ত্র ধারন করে বা হত্যা করে তবে সে ব্যক্তি কঠিনতম পাপে লিপ্ত হলো ।

আল্লাহ বলেন- " অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সামিল" (সুরা আল-মায়িদাঃ৩২)

" যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম । সেখানেই সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে । আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন, তার উপর লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন" (সূরা নিসা, আয়াত ৯৩)

আর জিহাদের সকল শর্ত পূরন হওয়ার পরেও যদি কেউ জীবনেও জিহাদ না করে , তাহলে তাঁর কোনো গোনাহ হবে,তিনি ফরজ তরকের গুনাহ করবেন । তিনি জিহাদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে ।

আল্লাহ বলেনঃ " মুমিনের মধ্যে যারা কোন অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও (জিহাদ না করে) ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান হন না। যারা নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন । উভয় প্রকারের মুমিনকেই আল্লাহ কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ... " (সূরা নিসা । আয়াত ৯৫)

জিহাদ বিষয়ে অন্য বিভ্রান্তি হলো , জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করা । সন্ত্রাস বা টেরোরিজম হলো – অবৈধভাবে সহিংসতা ব্যবহার করে সরকার বা জনগনকে ভীত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা হলো সন্ত্রাস । এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ও অন্যান্য গ্রন্থে এমনই বলা হয়েছে । যেখানে বৈধ ও অবৈধতা খুবই অস্পস্ট । ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে , বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ছিলো দখলদারদের নিকট সন্ত্রাসী । বর্ণবাদী আফ্রিকার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতা নেলসন মেন্ডেলা আমেরিকার দৃষ্টিতে ছিলেন সন্ত্রাসী । নেপালের মাওবাদিরা ছিলো অন্যদের নিকট সন্ত্রাসী ।

কিছু মুসলিমও জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত। আলী রাঃ এর সময়ে খারিজী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে জিহাদ বিষয়ক বিভ্রান্তি শুরু। উগ্রতা ও বাড়াবাড়ি ছিলো তাদের বিভ্রান্তির মূল । পাপের কারনে তারা ব্যক্তি মুসলিমকে এবং মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফির বলতো । জিহাদের ফযীলত বিষক আয়াত ও হাদীসের অপব্যখ্যা করে এবং কুরান ও হাদীসে উল্লেখিত জিহাদ বিষয়ক শর্তগুলি অস্বীকার করে তারা জিহাদকে ফরয আইন ও বড় ফরজ বলে দাবি করতো । অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে তারা আইন ও বিচার নিজের হাতে তুলে নিত । কুরআন ও হাদিসের কতিপয় বক্তব্যর অপব্যাখ্যা করে তারা এগুলি করতো । জিহাদের নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হতো । অথচ বিভিন্ন হাদিসে রাসুল সাঃ বারংবার বলেছেন যে, জালিম বা পাপী শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে

হবে ঘৃর্না করতে হবে , কোনো অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে নেওয়া যাবে না । রাসুল সাঃ বলেন- " যখন তোমরা তোমাদের শাসক-প্রশাসকগন থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ কর , তখন তোমরা তাঁর কর্মকে অপছন্দ করবে, কিন্তু তাঁর আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না" (মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮১)

তাই বলা যায়- জিহাদ সত্য। সন্ত্রাস মিথ্যা। জিহাদ হক। সন্ত্রাস বাতিল। জিহাদ ন্যায়। সন্ত্রাস অন্যায়।

মোটকথা, ইসলামের জেহাদ এবং অন্যদের যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে রয়েছে বহু পার্থক্য। তাই তো কোনো নিরপরাধ মানুষকে বোমা মেরে, গুলি করে হত্যা করে জিহাদ বলা হয় না। সেটা কখনো জিহাদ নয়। বরং তা সন্ত্রাস। আর ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে কিছুতেই সমর্থন করে না। বরং কঠোর হস্তে তা দমন করার নির্দেশ দেয়।

[1] The Daily Independent, Dhaka, sub-editorial 18/02/2006.

[2] The Wisdom of Ann Coulter, a News Network feature, The Independent (Dhaka), 8/9/2006, p 12.

[3] আজহারুল ইসলাম এ. কে. এম, নিন্দিত বিশ্ব নন্দিত গন্তব্য, পৃ. ৫৮-৫৯ (from www.rense.com/general127/let.htm)

[4] আজহারুল ইসলাম, নিন্দিত বিশ্ব, পৃ. ৯২-৯৩।

[5] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=50&chapter=6886

[6] মুকাদ্দিমাতু কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ২৪

[7] The Daily Independent, Dhaka, sub-editorial 18/02/2006.

[8] The Wisdom of Ann Coulter, a Newsnetwork feature, The Independent (Dhaka), 8/9/2006, p 12.

[9] আজহারুল ইসলাম এ. কে. এম, নিন্দিত বিশ্ব নন্দিত গন্তব্য, পৃ. ৫৮-৫৯ (from www.rense.com/general127/let.htm)

[10] আজহারুল ইসলাম, নিন্দিত বিশ্ব, পৃ. ৯২-৯৩।

বিষয়: সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি

তাপশঃ

সন্ত্রাসবাদ কি মুসলমানদের একচেটিয়া সম্পত্তি ? শুধু কি মুসলমানরাই সন্ত্রাসী?

আবদুল্লাহঃ

পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ বা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অসন্তোষ ও ঘৃণা। যে কোন ধরনের ফিৎনা বা বিপর্যয় সৃষ্টিকে প্রকাশ্য হত্যাকান্ডের চেয়ে ভয়াবহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "পৃথিবীতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না, আল্লাহ তাআলা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না"-সূরা আল-কাসাস: ৭৭।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "ফিৎনা বা সন্ত্রাস হত্যাকান্ডের চেয়ে মারাত্মক অপরাধ"(সূরা আল-বাকারা: ১৯১)। ইসলাম কখনো চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না। ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। সম্প্রীতি হলো ইসলামের মূলনীতি। উদারতা আর পরম সহিষ্ণুতাই ইসলামের শিক্ষা। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। হত্যাকারীর স্থান হবে জাহান্নামে উল্লেখ করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে।'- সূরা আন-নিসা: ৯৩

কতিপয় অজ্ঞ মুসলমান ইসলামের এই মূলবাণী উপেক্ষা করে সন্ত্রাসী পন্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে,তাতে তারা ইসলামের গায়ে কালিমা লেপন ছাড়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া, সমাজের জন্য কল্যানকর কিছু করতে পারেনি। এই অসাধু, মূর্খরা ইসলাম কে বিশ্বের বুকে অশান্তি তথা সন্ত্রাসীর ধর্ম হিশেবে পরিচিত করে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। আর এ সমস্ত গুটিকয়েক মূর্খ মুসলমানের কীর্তিকলাপ কে পুঁজি করে,বিশ্ব দরবারে পরিচিত করে দিয়েছে ইসলাম-বিদ্বেষিরা।আর মুসলমানদেরকে নির্দ্বিধায়, দেদারসে সন্ত্রাসী ধর্ম হিশেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আর বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের কে প্রতিপক্ষ করে তোলা হয়েছে।

যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।-- সূরা মায়িদাহ্ আয়াত ৩২) এই আয়াতে স্পষ্ট হয়েছে ইসলাম কতটা শান্তির ধর্ম,সন্ত্রাস ইসলামে কতটা ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় বিষয়। প্রকৃতপক্ষে,বেশীর ভাগ ধর্মই নিরীহ মানুষ হত্যা করাকে নিন্দা করে। অধিকাংশ ধর্মেই নিরীহ মানুষ হত্যা ঘৃণাভরে পাপ কাজ বলে বিবেচ্য, অননুমোদিত।আমরা ইতিহাস জানার মানসে বিশ্ব সন্ত্রাসী কার্যক্রমের একটু জরিপ দেখে আসি।

আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে,সাধারণত যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, মানবিক আচরণ ব্যাহত হয়, নির্বিচারে মানুষ মারা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ গোটা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাস নৃশংসতার উন্মত্ত তাণ্ডবের রক্তাক্ত দলিল।

স্পেন আর ফ্রান্সে সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম **E.T.A (EUSKADI TA ASKATASUNA)** তারা এ পর্যন্ত দেড়শোর বেশী সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। আর আফ্রিকায় অনেকগুলি সন্ত্রাসী সংগঠন রয়েছে। তন্মধ্যে,একটি প্রধান দল সবচেয়ে কুখ্যাত দলগুলোর একটা সেটা হল **The lords selvation army** এটা একটা খ্রিস্টানদের সন্ত্রাসী সংগঠন দল। তারা বাচ্চাদের সন্ত্রাসী আক্রমণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আর শ্রীলংকায় আপনারা **L.T.T.E (Liberation Tigers of Tamil Eelam)**-র কথা শুনেছেন তামিল টাইগার্স, তারা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে কুখ্যাত, সবচেয়ে হিংস্র সন্ত্রাসী দলগুলোর মধ্যে একটি। তাদের সদস্যরা আত্মঘাতী হামলার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী দক্ষ (Expert) এমনকি তারা বাচ্চাদেরও একাজে লাগায় এবং প্রশিক্ষণ দেয়,তারা বাচ্চাদের দিয়েও আত্মঘাতী হামলা ঘটায়। সাধারণভাবে আমরা প্যালেস্টাইনে আত্মঘাতী হামলাকারী বা ইরাকে আত্মঘাতী হামলাকারীর নাম শুনি। তবে ইতিহাস আমাদের বলে যারা এ আত্মঘাতী হামলাকে জনপ্রিয় করেছে, তারা হলো LTTE তামিল টাইগার্স, এরা কারা? এরা হিন্দু। কিন্তু ইন্ডিয়ান রিপোর্টার, সাংবাদিকরা তাদেরকে হিন্দু সন্ত্রাসী বলেনা, বলে LTTE তামিল টাইগার্স। যা আড়ালে তাদের পরিচয় গোপন থাকে।

আমরা জানি যে, ইন্ডিয়ান সরকার ১৯৮৪ সালের ৫ই জুন শিখদের স্বর্ণ-মন্দির দখল করে, সেখানে ১০০জন মানুষ মারা যায়, প্রতিশোধ হিসেবে কয়েক মাস পরে ১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর সে সময়ের ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করে, তারই একজন সিকিউরিটি গার্ড যিনি ছিলেন শিখ। যদি আপনি সাউথ এশিয়ান টেরোরিজমের ওয়েবসাইটে যান (এটা মুসলমানরা বানায়নি, বানিয়েছে অমুসলিমরাই) সেখানে সন্ত্রাসী আক্রমণের তালিকা টা দেখবেন। সব সন্ত্রাসী আক্রমণে মুসলমানদের যোগ্যতা খুবই কম,তবে মিডিয়ায় একথা গুলো কখনো বলা হয়না। পৃথিবীর কোনও দেশে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই মুসলমানদের ওপর তার দায়ভার চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা সচেতন জনগণ কয়েক দশক ধরে লক্ষ করছেন। অথচ এফবিআই এবং ইউরোপোলের গবেষণাধর্মী রিপোর্ট থেকে সম্প্রতি ভিন্ন চিত্র পাওয়া গেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলেছে, তার সিংহভাগই চালিয়েছে অমুসলিমরা। লোনওয়াচডটকম নামের ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাত্র দশমিক ৪ শতাংশ ঘটেছে মুসলিমদের দ্বারা। বাকি ৯৯.৬ ভাগই ঘটিয়েছে অমুসলিম বা অন্য ধর্মের অনুসারীরা। ১৯৮০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় যত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছে তার মাত্র ৬ শতাংশ মুসলিম নামধারীদের দ্বারা হয়েছে। বাকি ৪২ শতাংশ ল্যাটিন, ২৪ শতাংশ বাম মনোভাবাপন্ন, ৭ শতাংশ ইহুদি চরমপন্থী, ৫ শতাংশ সমাজতন্ত্রী ও ১৬ শতাংশ ঘটেছে অন্য গ্রুপগুলোর দ্বারা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, এশিয়ার বিভিন্ন দেশসহ ইউরোপ আমেরিকাতে কোনও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই ঢালাওভাবে এবং বাছবিচার না করেই মুসলমানদের ওপর তার দায় চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। বিশেষ করে এক শ্রেণীর মিডিয়া সন্ত্রাসের দায় মুসলিম সংগঠনসমূহের ওপর চাপিয়ে যেন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বগল বাজাতে শুরু করে দেয়।

আপনি উত্তর-পূর্ব ইন্ডিয়ার প্রদেশ ত্রিপুরা যান, সেখানে খ্রিষ্টান সন্ত্রাসী সংগঠন আছে, যেমন ATTF (all tripura tiger force) NLFT (national liberation front of tripura) এরা কারা? এরা খ্রিস্টান! এরা অনেক হিন্দুকে মেরেছে ইন্টারনেটে যান

দেখবেন তিনজন হিন্দু খুন, চারজন হিন্দু খুন, পাঁচজন হিন্দু খুন, ২০০৪ সালের ২রা অক্টোবর চুয়াল্লিশজন হিন্দু মারা যায় আরোও অনেকে আহত হয় তাদের আক্রমণে। আসামে আছে ULFA (United Liberation Front of Assam) উলফা একাই গত ১৬ বছর সময়ের মধ্যে ১৯৯০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তারা ইন্ডিয়ার মাটিতে চালিয়েছে ৭৪৯ টি আক্রমণ। তারা কাশ্মীরি বিদ্রোহীদেরও লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। ৭৪৯ টি নিশ্চিত সন্ত্রাসী আক্রমণ। তবে,খবরের কাগজে আমরা শুধু কাশ্মীরি সন্ত্রাসীদের আক্রমণের খবরই শুধু জানতে পারি। উলফাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় শুধু মুসলমানদের হত্যা করার জন্য, এরা কারা? এরা হিন্দু। আর একটি হচ্ছে নকশালপন্থীরা।মাওবাদীদের কথাও আমরা জানি মাওবাদীরা হল কমিউনিস্ট। আর ইন্ডিয়াতে কমিউনিস্টদের যতগুলো আক্রমণ হয়েছে বেশীরভাগই করেছে মাওবাদীরা। শুধুমাত্র নেপালেই গত সাত বছরে তারা ৯৯টা সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার নিউজ অনুসারে ৮৭৫ টি রকেট, গোলা বারুদের একটা ভান্ডার সেগুলো মাওবাদীদের কাছে পৌছানোর কথা ছিল।পুলিশ সেগুলো আটক করে সেইসাথে বাজেয়াপ্তও করে।তিরিশ টি রকেট লাঞ্চারও ছিলো। এটা ইন্ডিয়ার ইতিহাসে কোন সন্ত্রাসী সংগঠনের সবচেয়ে বড় অস্ত্রের চালান,যেটা সরকার ধরেছে। ৮৭৫ টি রকেট তারা ইন্ডিয়ার আর্মিদের সাথেও যুদ্ধ করতে পারে। সেসময় অন্ধ্র প্রদেশের ডিজিপি হতবাক হয়েছিলেন,তিনি বলেছিলেন যে এই রকেট লাঞ্চার দিয়ে তারা যেকোনো পুলিশ স্টেশনে হামলা করতে পারে! কোন ট্যাংককে ধ্বংস করতে পারে ৬০০ মিটার অর্থাৎ অর্ধ কিলোমিটারেরও বেশী দূর থেকে। আমাদের কিছুই করার থাকবেনা। কিন্তু তারপরও মানুষ ভয় পায় দাড়ি টুপি দেখে। তাহলে দাড়ি টুপি কি রকেট লাঞ্চারের চেয়েও বেশী বিপজ্জনক? কেনো এভাবে টার্গেট করা হচ্ছে,বিশেষ করে মুসলমানদের। মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে পলিটিশিয়ানরা, ইসলাম সব ধরনের সন্ত্রাসী কাজকে নিন্দা করে,নিরীহ মানুষ হত্যা করাকে ইসলাম নিন্দা করে। যাই হউক না কেন,হউক সেটা নাইন ইলেভেন সেই টুইন টাওয়ার আক্রমণ অথবা সে ৭ই জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে যে ৫০ জনের ও বেশী মানুষ মারা গেছে,নিউ ইয়র্ক টাওয়ারে তিন হাজারেরও বেশী মানুষ

মারা গেছে। লন্ডনের বোম ব্লাস্টে পঞ্চাশ জনেরো বেশী মানুষ মারা গেছে। অথবা ৯৩ এর সিরিয়াল বোম ব্লাস্টে বোম্বেতে সেখানে ২৫০ জনেরও বেশী মানুষ মারা গেছে। এগুলো সবই নিন্দনীয়, সবই নিষিদ্ধ। নিরীহ মানুষকে হত্যা করার পেছনে কোন যুক্তি পাওয়া যাবেনা। কিন্তু যখন এসব সন্ত্রাসের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় কোন মুসলমান কে,তখন তারা থেমে যায়।

আমরা অবশ্যই নিন্দা করব আফগানিস্তানে যে হাজার হাজার আফগানী মারা গেল,ইরাকে যে হাজার হাজার মানুষ মারা গেল,গুজরাটে যে হাজার হাজার মানুষ মারা গেল,লেবাননে যে হাজার হাজার মানুষ মারা গেল। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, সিরিয়া,মায়ানমারে যে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। এখানে আমরা থামতে পারি না, আপনি কাকে ভয় পাচ্ছেন? সব ধরনের সন্ত্রাস, যেখানে নিরীহ মানুষ মারা যায় সেগুলোর নিন্দা করা উচিৎ। সেটা মুসলমান করুক অথবা অমুসলিম করুক। আমাদের কাছে প্রমান নেই যে নাইন ইলেভেন অথবা ৭ই জুলাই অথবা বোম্বের ট্রেনের সিরিয়াল বোম ব্লাস্ট এগুলো মুসলমানরাই করেছে, এটা শুধুমাত্র একটা অনুমান। তবে যাই হউক,সত্য সেখানে যাই হউক সেটা মুসলমান করুক বা অমুসলমানরাই করুক,এর নিন্দা করা উচিৎ এর সবই নিষিদ্ধ। আমরা জানি যে বেশীর ভাগ ধর্মই একথা বলেনা যে আপনি নিরীহ মানুষকে হত্যা করেন।

তাহলে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় কোন দ্বিধা ছাড়াই, সন্ত্রাস শুধু মুসলমানদের সম্পত্তি নয়। শুধু সেটাই নয় এই সন্ত্রাসের ব্যাপারে মুসলমানদের তেমন কোন কৃতিত্বই নেই। ইসলামেও এটার অনুমোদন দেয়া হয়নি। ইসলামেও এটা নিষেধ করা আছে। আমরা এটা বলতে পারবনা যে সব ধর্মই বলে আপনি নিরীহ মানুষকে হত্যা করবেননা। তবে এটা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে, বেশীর ভাগ ধর্মই নিরীহ মানুষ হত্যা অনুমোদন করে না। ধর্ম গ্রন্থগুলো পড়লে জানতে পারবেন যে,নিরীহ কোন মানুষকে হত্যা করা উচিৎ না।

ইসলাম সব ধরনের সন্ত্রাসী কাজকে নিন্দা করে,নিরীহ মানুষ হত্যা করাকে ইসলাম নিন্দা করে।

সন্ত্রাস কোন ধর্মেরই একচেটিয়া সম্পত্তি না,কখনই না। তবে যদি ভাল করে দেখি,অনেক সন্ত্রাসী আছে তারা দাবি করে তারা কোন ধর্মের অনুসারী। যদি ভাল করে দেখি সব ধর্মেই এমন সন্ত্রাসী আছে,মুসলমান,খ্রিস্টান,বৌদ্ধ,ইহুদি,শিখ,হিন্দু, ক্যাথলিক সন্ত্রাসী আছে। সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী,যদি আমরা জরিপ করে দেখি,কোন লোকগুলি সবচেয়ে বেশী নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে তারা কোন ধর্মের অনুসারী।

১ নাম্বার যে লোকটা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে তার নাম কি, লোকটা কে,হিটলার,সে গ্যাস চেম্বারে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছে। আর পরোক্ষ ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লোক মারা গেছে ৬ কোটি। এই বিশ্ব যুদ্ধের নেতৃত্বে যারা ছিল তারা কি মুসলমান ছিল? জোসেফ স্টালিন(আংকেল জু) ধারণা করা হয় সে ২ কোটি মানুষ কে মেরে ছিল। তার নির্দেশে ১কোটি ৪৫ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেছে। এবার চীনের দিকে দেখি মাও সে তুং, চীনে দেড় থেকে ২ কোটি মানুষ হত্যা করেছে মাও সে তুং সেও ছিল অমুসলিম। ইতিহাস আমাদের বলে মুসোলিনি শুধুমাত্র ইটালিতেই মেরে ছিল ৪ লক্ষ মানুষ কে। নিরীহ সব মানুষ কে। যে লোকটার নামে ফরাসি বিপ্লবের নামকরণ করা হয়েছে মেক্সমিলিয়ান রবসপিয়ার তার নির্দেশে দু লক্ষেরও বেশী মানুষ অনাহারে আর অত্যাচারে মারা গেছে। হত্যা করা হয়েছে ৪০হাজারেরও বেশী মানুষ কে। অশোক শুধুমাত্র কলিঙ্গের যুদ্ধেই ১ লক্ষেরও বেশী মানুষ কে হত্যা করেছে। আমাদের ধর্মেও বেশ কিছু কুলাঙ্গার আছে, ইতিহাস বলে সাদ্দাম হোসেনের কথা, কয়েক লক্ষ মানুষ কে হত্যা করেছে, ইন্দোনেশিয়ায় মোহাম্মদ সোহার্ত, এই লোকটাও প্রায় ৫লক্ষ মানুষ কে হত্যা করেছে। তবে হিটলার, আংকেল জু,মাও সে তুং এর তুলনায় এটা কিছুই না। এদের কাছে মুসলমানদের সবগুলো হত্যাকাণ্ডই একটা শিশু। আমি একথা বলছিনা যে এ লোকগুলি তাদের ধর্ম ঠিকভাবে মেনে চলত। তারা কেউ ধার্মিক ছিলনা। তাহলে তারা কখনই এভাবে মানুষ হত্যা করতে পারত না।

কিন্তু তারপরও আমরা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় দেখি যে, মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে। মুসলমানদের মৌলবাদী, চরমপন্থি, সন্ত্রাসী, সাম্প্রদায়িক এবং আরোও বহু

নেতিবাচক উপধায় ভূষিত করা হচ্ছে ক্রমাগত ভাবে। কিন্তু, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র কোনদিনও সফল হতে পারবেনা। কেননা এর রক্ষক স্বয়ং বারী তায়ালা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। পরিশেষে একটি কথা দৃঢ় ভাবে বলতে চাই কোন ধার্মিক সন্ত্রাসী নয়,কোন সন্ত্রাসী কোন ধর্মেরই নয়।

[1]https://www.dailynayadiganta.com/post-editorial/587019/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0

[2] https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/ashar/30179374

বিষয়:বিশ্ব জনীন ভ্রাতৃত্ব

আরবী "উখওয়াত" শব্দের অর্থ- ভ্রাতৃত্ব। ভাইদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক। পারিভাষিক অর্থে পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য-সমপ্রীতী ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্ব বলে।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, সংঘাত-সহিংসতা, প্রতিহিংসা ও শত্রুতা বিরাজ করছিল। কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি, খুনোখুনি ও বিনা কারণে রক্তপাত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। প্রতিশোধ গ্রহণই ছিল তাদের নেশা। ফলে গোটা আরব জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এহেন নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুখ কঠিন অবস্থা থেকে তাদের ইসলামই রক্ষা করেছিল। কাজেই মানবজাতির জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থাস্বরূপ ইসলাম হচ্ছে মুসলমানদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার একান্ত অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ।

ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎ পথ লাভ করতে পারো।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩)

ইসলাম-পূর্ব মানবজাতি একে অপরের শত্রুভাবাপন্ন ছিল। এই শত্রুতা এমন চরম আকার ধারণ করত যে তারা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো আর এই যুদ্ধ বহুদিন যাবৎ স্থায়ী থাকত। শান্তির ধর্ম ইসলাম এক মুসলমানের সঙ্গে অন্য মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন করেছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার তাগিদ দিয়েছে। জাহেলি যুগে আরব ও অনারবদের মধ্যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে থাকত। ইসলাম তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলে ঐক্যবদ্ধ করল। মহানবী (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন, 'অনারবদের ওপর আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং

আরবদের ওপরও অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' এতে প্রাক-ইসলামি যুগের যাবতীয় কুসংস্কার, অন্ধ অনুসরণ এবং ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত-সংঘর্ষ ও হানাহানি অপসৃত হয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় তাওহিদভিত্তিক মানবতার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সমাজ, যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে নিতান্তই বিরল।

ইসলামই সব মুসলমানকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার হাত প্রসারিত করল। তাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একতাবদ্ধ হয়ে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিতে পারে না এবং অন্যায়-অত্যাচার বা জুলুম-নির্যাতন করতে পারে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে অত্যাচার করবে না এবং তাকে শত্রুর কাছে সমর্পণও করবে না। আর যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন।' (বুখারি ও মুসলিম) তিনি আরও বলেছেন, 'তোমার ভাইকে সাহায্য করো। সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিতই হোক, যদি সে অত্যাচারী হয় তবে তাকে তার অত্যাচার করা হতে বাধা প্রদান করো। আর যদি সে অত্যাচারিত হয় তবে তাকে সাহায্য করো।' (দারেমি)

আরববাসী যে কদর্য অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল তা থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করেছেন এবং বলেছেন এখন থেকে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে, কাজেই তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হবে না। ইসলাম পৃথিবীতে বিরাজমান সর্বপ্রকার শত্রুতা, বিভেদ ও বৈষম্য বিদূরিত করে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ করেছে। পবিত্র কোরআনে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, তাহলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে; আর তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।' (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬)

ঐক্য শব্দের অর্থ হলো একতা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ফলে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক দিয়েও মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যেমন দুটো দেশ বা দুটো দল ঐক্যবদ্ধ হলে বা শান্তিপূর্ণ সমঝোতায় উপনীত হলে তখন আর কোনো অশান্তি নেই। শান্তি চুক্তিতে ঐক্যবদ্ধ একটি জাতি হিসেবে তাদের গড়ে তুলতে এ সমুদয় সাযুজ্য কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন হলো একজন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি দয়া, মায়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। তারা একে অপরের সুখে সুখী হবে এবং একে অপরের দুঃখে দুঃখী হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তুমি মুমিনদের তাদের পারস্পরিক দয়া প্রদর্শন, পারস্পরিক ভালোবাসা প্রদর্শন এবং পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে একই দেহের ন্যায় দেখবে। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে তখন এ জন্য সব দেহই নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে।' (বুখারি ও মুসলিম)

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকার ভ্রাতৃত্বই ফলপ্রসু হতে পারে এবং মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে- ১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, ২. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব:

পৃথিবীর সব মানুষ হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর সন্তান। তাঁরা আমাদের সকলের আদি পিতামাতা। তাঁদের থেকেই এই পৃথিবীর সব মানুষের বিকাশ। আদম (আ.) এর এই আদি পিতৃত্ব বিবেচনায় পৃথিবীর সব মানুষ ভাই ভাই সম্পর্কে সম্পৃক্ত। ভ্রাতৃত্বের এ ধারাটি পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত বলে এ ভ্রাতৃত্বের নাম বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।

আল্লাহ তায়ালা এর স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন- হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রভূক্ত বানিয়েছি। যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার, (হুজুরাত, ১৩)।

রাসূল (সা.) বলেন- তোমরা সকলেই আদম হতে এবং আদম মাটি হতে সৃষ্টি, (সুনানু আবু দাউদ, ৪৪৫২)। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় যে, আমরা সবাই আদম ও হাওয়া (আ). এর সন্তান। সুতরাং আমরা পরস্পরের ভাই ভাই। এটা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।

আর ইসলাম আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ও অনুসারী হওয়ার কারণে দেশ, ভাষা, বর্ণ, গোত্র, আকার, প্রভৃতি নির্বিশেষে

সকল মুসলমান ভাই ভাই, এটাই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। আল্লাহ বলেন- নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, (হুজুরাত, ১০)। আর রাসূল (সা) বলেছেন- এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, (বুখারী, ২২৬২)।

২. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব:

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলে এবং মৌলিক মানবীয় গুণাবলীকে বিকশিত করে।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বৈশিষ্ট্য-

ক) তাওহীদ ও রিসালাতভিত্তিক: ইসলামী ভ্রাতৃত্ব তাওহীদ বা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস নির্ভর ভ্রাতৃত্ব। রাসুলের (সা) রিসালাত এবং রিসালাতের মাধ্যমে আনিত বিষয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে এ ভ্রাতৃত্ব অস্তিত্ব লাভ করে। এ কারণে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব হলো তাওহীদ ও রিসালাতভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব। এ ভ্রাতৃত্বের মূলমন্ত্র হলো- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।

খ) পারস্পারিক ভালোবাসাভিত্তিক: ইসলামী ভ্রাতৃত্বের রক্ত সম্পর্কীয় ভ্রাতৃত্বের চেয়েও অধিকতর ভালোবাসার প্রকাশ থাকে। কেননা অন্যকোন ভিত্তি নয় বরং শুধু ভালোবাসার ভিত্তিতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠে এবং টিকে থাকে। এ হলো আল্লাহ তায়ালার মহান পরিকল্পনার অংশ। তিনি বলেন- তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে সমপ্রীতি স্থাপন করেছেন। আর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে, (আল-ইমরান, ১০৩)।

গ) সুদৃঢ় একতাভিত্তিক: ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বিশ্বাস, জীবন দর্শন ও জীবনবিধান অনুশীলনের অভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যে জন্যে এ ভ্রাতৃত্ব মুসলিমদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে। তাদের ঐক্য ও সংহতির সুদৃঢ়তার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন। তিনি ঘোষণা করেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর, (সূরা ছফ, ৪)।

ঘ) নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব: ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সব স্বার্থপরতার মুলোৎপাটন করে আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার ভিত্তিতে নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলে। এ ভ্রাতৃত্বের দাবিতে মুমিনগণ একজন অপর জনের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে পরিণত হন। রাসুল (সা) বলেন- একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে শত্রুর হাতে সমর্পণও করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন, (বুখারী, ২২৬২)।

ঙ) দয়া ও কল্যাণকামিতা: ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পারস্পারিক কল্যাণকামিতা ও দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে এক ভাই অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে। কেননা এ কল্যাণ কামনা তাকে পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং পরকালে দেয় মুক্তির নিশ্চয়তা। রাসুল (সা) বলেন- এক মুসলিম অপর মুসলিমের উপস্থিত বা অনুপস্থিত অবস্থায় কল্যাণ কামনা করবে, (তিরমযি, ২৬৬১)।

চ) উদারতা ও সাম্যবাদভিত্তিক : ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মূলত বিশ্বভ্রাতৃত্বেরই আদর্শিক রূপ। এ ভ্রাতৃত্বে সব জাতির নিকট প্রেরিত আল্লাহর নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান পোষণ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, (বাকারাহ, ২৮৫)।

তাছাড়া ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মানবিক সাম্যবাদের সুমহান আদর্শভিত্তিক। শুধু মানুষ হিসেবে এ ভ্রাতৃত্বে কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়নি। রাসূল (সা.) বলেছেন- "মানুষ চিরুণীর দাঁতের মতো, আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই অনারবের উপর, শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হতে পারে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সে, তোমাদের মধ্যে যে বেশি তাকওয়াবান, (সূরা হুজুরাত, ১৩)।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব:

ইসলাম সার্বজনীন, সর্বকালিন জীবন ব্যবস্থা। যে জন্যে পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে এব সুমহান আদর্শিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। ইসলামী

ভ্রাতৃত্ব তাই বিশ্ব ভ্রাতৃত্বেরই বিশেষ রূপ। প্রথাসিদ্ধ বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ক) ঈমানের একান্ত দাবি: ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কারো ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ তাআলা ও রাসুলের (সা.) ওপর ঈমান আনার সাথে সাথে মুমিনদের মধ্যে এ ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। এ ভ্রাতৃত্ব ঈমানী ভ্রাতৃত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন- মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, (৪৯/১০)। এ ভ্রাতৃত্ব সর্বব্যাপী বিস্তৃত। এটি ব্যাপক এবং সার্বজনীন। ইসলামী উখওয়াতের এ ঈমানী দাবির ব্যাপকতার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই তা বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

খ) পারস্পারিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা: পৃথিবীর সব প্রান্তের মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সুন্দর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহের ফলে তারা সুমধুর সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। (ইসলাম গ্রহণের পর) তোমাদের অন্তরে আল্লাহ সমপ্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন। এরপর তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে (সূরা আল- ইমরান, ১০৩)। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব তাই মানুষে মানুষে স্নেহ, মায়া, মমতা ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে সৌহার্দ ও সমপ্রীতি গড়ে তোলে।

গ) সাম্য প্রতিষ্ঠা: সার্বজনীন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির সবচেয়ে বড় বাধা হলো মানুষের তৈরি করা বিভিন্ন বিভেদ-বৈষম্য। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এ সব বিভেদ দূর করে মানুষ হিসেবে সকলের মানবিক মর্যাদা ও অধিকারের সমতা নিশ্চিত করে। রাসুল (সা.) বলেন- অনারবদের ওপর আরবদের বা আরবদের ওপর অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং তোমরা সবাই আদম সন্তান এবং আদম মাটির তৈরি, (আহমদ, ২২৩৯১)।

ঘ) আত্মশুদ্ধি ও আত্মরক্ষা: মানুষ মাত্রই ভুল করে। তার হৃদয়ে অনেক খারাপ বিষয় স্থান করে নিতে পারে। মানুষের এই ভুল ও খারাপ প্রবণতা পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে। এ জন্যে রক্ত সম্পর্কীয় সব রকমের ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয়। ইসলামী উখওয়াত

পারস্পারিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী এসব ত্রুটি সংশোধনে ভূমিকা পালন করে। রাসূল (সা.) বলেন- নিশ্চয়ই তোমরা এক ভাই অন্য ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। কাজেই কেউ যখন অপরের মধ্যে খারাপ কিছু দেখে তখন যেন সে তা দূর করে দেয়, (সুনানু তিরমিযি, ১৮৫২)।

ঙ) নিরাপত্তা বিধান: একজন অপরজনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করলে বা জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের জন্য হুমকিতে পরিণত হলে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব কারো নিরাপত্তা ব্যাহত করে না, বরং এ ভ্রাতৃত্ব মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। রাসূল (সা.) বলেন- একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করবে না, তাকে শত্রুর হাতে সমর্পণও করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন, (মুসলিম, ৪৬৭৭)।

চ) সাহায্য-সহযোগীতা বৃদ্ধি: মানুষ একা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর নয়। সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য তাকে অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। পারস্পারিক সাহায্য সহযোগিতার ফলে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। রাসূল (সা.) তাই পারস্পারিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে বলেছেন- যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখবে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখবেন, (সহিহ বুখারী, ২২৬২)।

অতএব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মতনির্বিশেষে মানবজাতিকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। এক দল বা গোত্র অন্য দল বা গোত্রের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর আভিজাত্য প্রকাশ করবে না। সবার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সৌহার্দ্য ভাব স্থাপন করতে হবে। সমাজে মানুষে মানুষে যে সংঘাত-সহিংসতা, কলহ-বিগ্রহ, হানাহানি, খুনোখুনি, লুটতরাজ, হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা চলছে, এসব অনাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সবাইকে মানবতার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

বস্তুত বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রায় সমার্থক। বিশ্বভ্রাতৃত্ব যেমন দেশের সীমানা মানে না তেমনি ইসলামী ভ্রাতৃত্বেও দেশ, কাল, বর্ণ বা অঞ্চল কোন গুরুত্ব পায় না, বরং এর সাথে যুক্ত হয় দায়িত্বশীলতা। এভাবে বিশ্বভ্রাতত্বের চেয়েও ব্যাপক এবং দায়িত্বশীল ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব তার গুরুত্ব প্রমাণ করে।

[1] https://www.amarsangbad.com/newspaper/news-172069

[2]https://www.prothomalo.com/opinion/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%90%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC

উপসংহার

ইসলাম বিশ্বজনীন ও কালজয়ী ধর্ম। এর আহকাম ও নির্দেশাবলী ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ। ইসলাম শান্তি, সন্ধি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলাম ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রীতি, মিলন, সহানুভূতি ও সমবেদনার ধর্ম। ইসলাম উন্নয়ন ও বদান্যতার ধর্ম। যার আহকাম ও নীতিমালায় রয়েছে সরলতা ও উদারতা।

এককথায় বলা যায় ইসলাম কল্যাণকর এক মহৎ জীবন ব্যবস্থা, এতে যাবতীয় পবিত্র ও উত্তম বিষয় ও বস্তুকে বৈধ করা হয়েছে। কেননা বস্তু মাত্রের মাঝেই কিছু কল্যাণ ও কিছু অকল্যাণের সমাহার রয়েছে। গুনাগুণের বিচারে যে বস্তুতে মানুষের জন্য কল্যানকর উপাদানের পরিমাণ বেশী, অকল্যানের পরিমাণ কম, সেই গুলোকেই মহান আল্লাহ মানুষের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। আর যে সকল বস্তুতে কল্যান কম অথচ অকল্যানের পরিমাণ বেশী, সেগুলোকে মনুষের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। যেমন মদ হারাম হওয়ার কারণ কুরআনে বর্ননা করা হয়েছে অতএব, আমাদেরকে খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-আষাক এবং বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার, এমনকি যাবতীয় আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেগুলো যেন হালাল ও উত্তম হয়। যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্নক পদার্থ্য দিয়ে তৈরী অথবা যা মানুষের মানবতা বোধকে ধ্বংস করে অথবা যা মানুষের জন্য পাশবিকতার জন্ম দেয় এবং তার সংযমী স্বভাবকে বিনষ্ট করে! কিংবা যা মানুষের আধ্যাতিক ও নৈতিক ক্ষতির (ব্যধি) কারণ হয়, এসকল বস্তুপড়ে ও উপার্জন মাধ্যম অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তাছাড়া যেসব উপায় দম্ভ, অহংকার জন্ম দেয়, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধকে নষ্ট করে, নিষিদ্ধ ভোগ-বিলাসের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে, জুলুম-স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্নকেন্দ্রিকতার জন্ম দেয়, দুশ্চরিত্রের প্রতিধাবিত করে, মুসলমানদেরকে অবশ্যই এসব মাধ্যম বর্জন করতে হবে।

সুদ, সুদের অপকারিতা ও তার ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে বেশি বেশি আলোচনা হওয়া দরকার। কারণ যে সুদী কারবার করে সে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর কোনো মুসলমান এমনটি কল্পনাও করতে পারে না। তাই এ থেকে দূরে থাকতে প্রতিটি মুসলমানের জন্য সুদের বিধান ও তার প্রকার-প্রকরণ জানা

অপরিহার্য।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি অভাবী লোককে সুযোগ দিবে অথবা তার প্রাপ্য মাফ করে দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ ছায়াতলে স্থান দিবেন।[1]

সুদ মানুষের সৌহার্দ্য-সহানুভূতির চেতনাকে গলা টিপে হত্যা করে। কারণ ঋণী ব্যক্তির সকল সম্পদ হাতছাড়া হতে দেখেও সুদখোরের অন্তরে মায়া জাগে না। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'দয়া-মায়া তার অন্তর থেকেই ছিনিয়ে নেয়া হয় যে হতভাগার দলে যোগ দিয়েছে।'[2]

তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ তার ওপর দয়া দেখান না যে মানুষকে দয়া করে না।'[3]

অন্য হাদিসে তিনি বলেন, 'দয়াকারীদের ওপর দয়াবান-রহমান দয়া করেন। তোমরা জমিনবাসীদের ওপর দয়া করো; আসমানবাসী তোমাদের ওপর দয়া করবেন।[4]

সুদ ব্যক্তি এবং দলের মাঝে হিংসা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। অনৈক্য এবং বিশৃংখলা উস্কে দেয়।[5]

সুদ মানুষকে এমন সব কাজে উদ্বুদ্ধ করে যার ফলাফল তার সহ্য ক্ষমতার বাইরে। এ ছাড়াও সুদের অনেক ক্ষতি রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তবে আমাদের জন্য এতটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা সেটাই হারাম করেন যার মাঝে শুধু অনিষ্ট ও অকল্যাণই রয়েছে। যার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। আমাদের রুজি-রোজগার যখন এসব থেকে পূতপবিত্র হবে তখনই তা হালাল ও সিদ্ধ হবে।

ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ও হত্যা'র বিষয়ে মিডিয়াতে যা কিছু বলা হয় তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার। এরূপ মিথ্যা প্রচারণার পাশাপাশি প্রকৃতই কিছু মুসলিম ইসলামের নামে, ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে বা অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে হত্যা বা ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। সত্য ও মিথ্যা এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণ সম্পর্কে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখছি যে, সারা বিশ্বে অমুসলিম ও মুসলিম গবেষক-বুদ্ধিজীবীগণ

জঙ্গিবাদের যে সকল কারণ উল্লেখ করছেন সেগুলির অন্যতম: (১) ইসলাম, (২) ইসলামী শিক্ষা, (৩) ওহাবী মতবাদ ও (৪) পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র।

এসব উগ্রতার প্রসারে ইসলামী শিক্ষার যে বিষয়গুলিকে বিকৃত করা হয় সেগুলির তাত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য সমাজের প্রাজ্ঞ আলিমগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণমাধ্যমে সুযোগ দেওয়া অতীব জরুরী। একজন রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতা যদি বলেন ‘‘ইসলাম শান্তির ধর্ম... ইত্যাদি’’ তাতে সন্ত্রাসে লিপ্ত যুবক পরিতৃপ্ত বা ‘কনভিন্সড’ হবে না; তবে যদি একজন প্রাজ্ঞ নেককার আলিম এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন তাহলে তা হয়ত তাকে পরিতৃপ্ত বা ‘কনভিন্সসড’ করতে পারবে। ইবাদত যদি কুরআন-সুন্নাহর শেখানো পদ্ধতিতে সুন্নাত-সম্মত পন্থায় পালন করতে পারি, তবে আমরা অভাবনীয় সাওয়াব অর্জন করতে পারব। বিশেষত কুফর, ইলহাদ, ব্যক্তিমতপূজা, স্বার্থপরতা ও অবক্ষয়ের যুগে দাওয়াত ও আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব পালন খুবই বড় কাজ। এ পরিস্থিতিতে সুন্নাতপদ্ধতিতে দাওয়াতের দায়িত্ব পালনকারী একজন মুমিন ৫০ জন সাহাবী বা সিদ্দীকের সাওয়াব লাভ করবেন বলে সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।[6] কিন্তু আমরা যদি এ ইবাদত কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতির ব্যতিক্রমভাবে পালন করি বা আমাদের প্রবৃত্তি ও প্রতিশোধস্পৃহার তাড়নায় উগ্রতায় লিপ্ত হই তাহলে আমরা কঠিন পাপে নিপতিত হওয়ার পাশাপাশি ইসলাম ও দীনী দাওয়াতকে কলঙ্কিত করব এবং প্রকৃত অর্থে আমরাই আল্লাহর কাছে ‘‘ইসলামের শত্রু’’ বলে গণ্য হব। নাউযূ বিল্লাহ মিন যালিকা ! মুমিনের আচরণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

المُؤمِنُ يألَفُ ويُؤلَفُ ولا خيرَ فيمَنْ لا يألَفُ ولا يُؤلَفُ

‘‘মুমিন ঐ ব্যক্তি যে নিজে অন্যদেরকে ভালবাসে এবং অন্যেরাও তাকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি নিজে অন্যদের ভালবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসে না তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।’’[7]

মুমিনের এ প্রকৃতি কাদের জন্য? যারা তার দলের, মতের বা তাকে ভক্তি করে তাদের জন্য? না জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য? দেশের প্রায় ৯০% মুসলিম দীন সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা রাখেন না। তারা ইসলাম বলতে যা বুঝেন তা তারা পালন ও প্রতিষ্ঠা করেন। তাদেরকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করা আলিম ও দায়ীগণের দায়িত্ব। কষ্ট করে দীনের দাওয়াত না দিয়ে আপনি রাতারাতি ইসলাম কায়েম করতে চান? পাপের কারণে আপনি পাপীদেরকে মেরে কমিয়ে ফেলতে চান? অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাফিরদেরকে বাঁচাতে উদগ্রীব ছিলেন, হয়ত তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের মধ্য থেকে কেউ মুসলিম হবে। মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তায়েফে যেয়ে পেলেন নির্মমতম অত্যাচার। সে সময়ে জিবরাঈল (আঃ) পাহাড়ের ফিরিশতাকে নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে বলেন, আপনার অনুমতি হলে পাহাড় উঠিয়ে এ সকল জনপদ ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কঠিনতম কষ্টের সে মুহূর্তেও তিনি বলেন,

بل أرجو أن يخرجَ اللهُ من أصلابهم من يعبد اللهَ وحده، لا يشركُ به شيئًا

“না। বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ হয়ত এদের ঔরস থেকে এমন মানুষের জন্ম দেবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কিছু শরিক করবে না।”[৪] যে কাফিরগণ তাঁর দেহকে রক্তরঞ্জিত করছে তাদেরই জন্য তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, যেন তাঁকে আঘাতের কারণে আল্লাহ তাদের ধ্বংস না করেন। তিনি তাঁর কপালের রক্ত মুছছেন এবং বলছেন,

ربِّ اغفرْ لقومي فإنهم لا يعلمونَ

“হে আমার প্রতিপালক, আমার জাতিকে আপনি ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না।”[৯]

ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা দেখি যে, সুন্নাতের আলোকে সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। অন্যায় পরিবর্তনের আবেগ, দ্রুত ফল লাভের উদ্দীপনা বা অন্যায়ের প্রতি অপ্রতিরোধ্য ঘৃণা ইত্যাদির কারণে আবেগী হয়ে যারা সন্ত্রাস, সহিংসতা বা যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছেন তারা ইসলামের কোনো কল্যাণ করতে পারেন নি। খারিজীগণ, বাতিনীগণ ও অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তাদের অনুসারীদের অনেক গরম ও আবেগী কথা বলেছেন এবং অনেক 'পরিবর্তনের' স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু তারা স্বল্প সময়ের কিছু ফিতনা ছাড়া কিছুই করতে পারেননি। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থা অনুসারী আলিমগণ বিদ্রোহ, উগ্রতা, শক্তিপ্রয়োগ, জোরপূর্বক সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিহার করে শান্তি-পূর্ণভাবে জনগণ ও সরকারকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে যুগে যুগে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় রোধ করেছেন।

"ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ"-এর ইতিহাস, প্রেক্ষাপট, কারণ, উত্তরণ ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের কর্মধারার আলোকে কিছু কথা লিখলাম। এর মধ্যে যদি কোনো কল্যাণকর কিছু থাকে তবে তা আমার করুণাময় প্রতিপালক আল্লাহ জাল্লে জালালুহুর একান্ত দয়া। আর এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি যা আছে তা সবই আমার নিজের দুর্বলতা ও শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয়তম হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীগণের উপর। আর প্রথমে ও শেষে, সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্তে।

[1]. মুসলিম : ৩০০৬

[2]. আবু দাউদ : ৪৯৪২, তিনমিযি : ১৯২৩

[3]. বুখারি : ৭৩৭৬, মুসলিম : ২৩১৯

[4]. আবু দাউদ : ১৯৪১, তিরমিযি : ৯২৪

[5]. তাওযিহুল আহকাম ফি বুলুগিল মারাম : ৪/০৭

[6] আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/১২৩, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৩০; তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৫৭; আলবানী, সহীহাহ ১/৮১২।

[7] আলবানী, সহীহুল জামি' ২/১১৩০-১১৩১। হাদিসটি হাসান।

[8] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪২০।

[9] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৮২, ৬/২৫৩৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৪৭; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/২৫৪; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৬/৫২১, ৭/৩৭২-৩৭৩, ৮/৫০৮, ১১/১৯৬, ১২/২৮২।

[10] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=50&chapter=6952

তথ্যসুত্র

ভুমিকা

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=8&chapter=1612

মানুষের জন্য আমিষ খাবার কি অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ

[1] মানুষের জন্য আমিষ খাবার কি অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ - ডা. জাকির নায়েক

[2] https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/annesa/28911079

[3] https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=85932

সুদমুক্ত অর্থনীতি

[1]. মুগনি লি ইবনে কুদামা : ৬/৫৩, নাইলুল আওতার : ৬/৩৪৬-৩৫৮

[2] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=29&chapter=3726

[3] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=29&chapter=8209

[4] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=29&chapter=8210

[5] সুদমুক্ত অর্থনীতি: ডা. জাকির নায়েক

মিডিয়া ও ইসলাম

[1] https://at-tahreek.com/article_details/8753

[2] https://at-tahreek.com/article_details/8810

[3] মিডিয়া এন্ড ইসলাম: ডা. জাকির নায়েক

সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ

[1] The Daily Independent, Dhaka, sub-editorial 18/02/2006.

[2] The Wisdom of Ann Coulter, a News Network feature, The Independent (Dhaka), 8/9/2006, p 12.

[3] আজহারুল ইসলাম এ. কে. এম, নিন্দিত বিশ্ব নন্দিত গন্তব্য, পৃ. ৫৮-৫৯ (from www.rense.com/general127/let.htm)

[4] আজহারুল ইসলাম, নিন্দিত বিশ্ব, পৃ. ৯২-৯৩।

[5] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=50&chapter=6886

[6] মুকাদ্দিমাতু কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ২৪

[7] The Daily Independent, Dhaka, sub-editorial 18/02/2006.

[8] The Wisdom of Ann Coulter, a Newsnetwork feature, The Independent (Dhaka), 8/9/2006, p 12.

[9] আজহারুল ইসলাম এ. কে. এম, নিন্দিত বিশ্ব নন্দিত গন্তব্য, পৃ. ৫৮-৫৯ (from www.rense.com/general127/let.htm)

[10] আজহারুল ইসলাম, নিন্দিত বিশ্ব, পৃ. ৯২-৯৩।

সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি

[1]https://www.dailynayadiganta.com/post-editorial/587019/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-

%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0

[2] https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/ashar/30179374

[3] সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি - ডা. জাকির নায়েক

বিশ্ব জনীন ভ্রাতৃত্ব

[1] https://www.amarsangbad.com/newspaper/news-172069

[2]https://www.prothomalo.com/opinion/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%90%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC

[3] বিশ্ব জনীন ভ্রাতৃত্ব - ডা. জাকির নায়েক

উপসংহার

[1]. মুসলিম : ৩০০৬

[2]. আবু দাউদ : ৪৯৪২, তিনমিযি : ১৯২৩

[3]. বুখারি : ৭৩৭৬, মুসলিম : ২৩১৯

[4]. আবু দাউদ : ১৯৪১, তিরমিযি : ৯২৪

[5]. তাওযিহুল আহকাম ফি বুলুগিল মারাম : ৪/০৭

[6] আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/১২৩, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৩০; তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৫৭; আলবানী, সহীহাহ ১/৮১২।

[7] আলবানী, সহীহুল জামি’ ২/১১৩০-১১৩১। হাদিসটি হাসান।

[৪] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪২০।

[৯] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৮২, ৬/২৫৩৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৪৭; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/২৫৪; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৬/৫২১, ৭/৩৭২-৩৭৩, ৮/৫০৮, ১১/১৯৬, ১২/২৮২।

[10] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=50&chapter=6952

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111409375/